ট্যুরিস্ট পুলিশ
হ্যান্ডবুক

ট্যুরিস্ট পুলিশ
বাংলাদেশ

ট্যুরিস্ট পুলিশ
হ্যান্ডবুক

Graphics14\\E:\CREATIVE\11 Course Handbook (Tourist Police)\Tourist Police Handbook.doc **18.09.23**

ট্যুরিস্ট পুলিশ
হ্যান্ডবুক

ট্যুরিস্ট পুলিশ
বাংলাদেশ

ট্যুরিস্ট পুলিশ হ্যান্ডবুক
ট্যুরিস্ট পুলিশ, বাংলাদেশ

© প্রকাশক
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশক ট্যুরিস্ট পুলিশ, বাংলাদেশ
ফারইস্ট টাওয়ার, লেভেল ০৮, ০৯ ও ১০
৩৫ তোপখানা রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
মোবাইল: ০১৩২০২২২২২২, ০১৮৮৭৮৭৮৭৮৭
ফোন: ০২ ২২৪৪০৫৭২১ ফ্যাক্স: ০২ ৮৩৯৬৬১৩

পরিবেশক পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭, বাংলাদেশ
ফোন ৮৮০ ২ ৪৭১১৭৬৬৮, ৫৮৩১৬১২০, ৫৮৩১০১৫৬, ৫৮৩১৪৮০৩
ফ্যাক্স ৮৮০ ২ ৪৮৩১৮৫২৬
ই-মেইল creativebooks@panjeree.net
ওয়েব www.panjeree.com

প্রকাশকাল প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রচ্ছদ গৌতম ঘোষ
অঙ্গসজ্জা মো. আলআমিন

মুদ্রণ বারতোপা প্রিন্টার্স লি.

আন্তর্জাতিক পরিবেশক এনআরবি স্কলার্স পাবলিশার্স
১৬৯-০৮ গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে
জ্যামাইকা এস্টেটস, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, যুক্তরাষ্ট্র

প্রশান্তিকা বইঘর
২/৫২ রেলওয়ে পিডিই, লাকেম্বা
এনএসডাব্লিউ ২১৯৫, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

শুভেচ্ছা মূল্য ২৫০ টাকা

Tourist Police Handbook
A Traning Manual by Tourist Police, Bangladesh
Cover Design by Gautam Ghosh
First Published in September 2023
by Panjeree Publications Ltd.
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217, Bangladesh

MRP : Taka 250/ US $ 12

ISBN : 978-984-98000-6-4

প্রাককথন

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে দেশ হতে দেশান্তরে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির সাথে সাথে পর্যটন সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। পর্যটন পরিগণিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন সম্ভাবনাময় দেশ। সাগর, পাহাড়, নদী, বন-বনানী, ঋতুবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, লোকশিল্প, দেশীয় খাবার ও গ্রাম বাংলার আবহমান রূপ পর্যটকদের কাছে অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

পর্যটনে নিরাপত্তা ইস্যু একটি বড়ো গুরুত্ব বহন করে। নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পর্যটকগণ তাদের গন্তব্য নির্বাচন করে থাকেন। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অভাব শুধু কোনো ব্যক্তির অবকাশযাপনকেই বাধাগ্রস্ত করে না, বরং এটি একটি দেশের পর্যটন শিল্পকেও ধ্বংস করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, পর্যাপ্ত সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার মিলিত রূপই একটি গন্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কোনো একটি ছোটো অপরাধই পর্যটন গন্তব্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে যথেষ্ট। পর্যটন স্পটে অপরাধ সংঘটিত হলে তা পর্যটকদেরকে শঙ্কিত করে এবং পর্যটন গন্তব্য সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়। তাই পর্যটন গন্তব্যে যেকোনো অপরাধ রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যুলালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের পর্যটনখাতে নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠিত হয়। পর্যটকদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্পট সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিশেষায়িত ইউনিট নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ট্যুরিস্ট হেল্প লাইন, ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং অত্যাধুনিক ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ ইতোমধ্যেই পর্যটকদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ট্যুরিস্ট পুলিশের সেবা প্রদানের ধারা পুলিশের অন্যান্য ইউনিট থেকে অনেকটাই পৃথক। পর্যটন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ড. পিটার ই টারলো তাঁর *Tourism Security* বইয়ে উল্লেখ করেন, ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট শুধুমাত্র পর্যটকদের নিরাপত্তাই প্রদান

করে না, একই সাথে তারা একটি যথার্থ পর্যটন শিল্পের চিত্র তুলে ধরে।' পর্যটন নিরাপত্তা এমন একটি পেশা, যার জন্য বিদেশি ভাষা, আন্ত-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, শ্রবণ দক্ষতা, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তাই গতানুগতিক ভাবধারা হতে বেরিয়ে এসে ট্যুরিস্ট পুলিশের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জরুরি। এই প্রয়াসেই *ট্যুরিস্ট পুলিশ হ্যান্ডবুক* বইটি প্রণয়নের চেষ্টা। এ বইটিতে ১১টি অধ্যায়ে পর্যটক, পর্যটন, পর্যটন সম্পদ, পর্যটন গন্তব্য, পর্যটন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, নিরাপত্তা, পর্যটন নৈতিকতা, স্টেকহোল্ডারগণের দায়িত্ব ও ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সীমিত সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছে বিধায় বইটিতে ভাষাগত ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠকগণের পরামর্শ ভবিষ্যতে বইটিকে আরও সুন্দর ও সফল করে তুলবে। পরিশেষে, *ট্যুরিস্ট পুলিশ হ্যান্ডবুক* বইটি ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সহায়তা করবে এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের সকল সদস্যের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা রাখি।

ট্যুরিস্ট পুলিশ হ্যান্ডবুক বইটি প্রণয়নে ট্যুরিস্ট পুলিশের পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াছমিন খাতুন ও তাঁর দল অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এজন্য তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে এবং 'স্মার্ট ট্যুরিস্ট পুলিশ' গঠনে হ্যান্ডবুকটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ঢাকা
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

হাবিবুর রহমান বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)
অতিরিক্ত আইজিপি
ট্যুরিস্ট পুলিশ
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায় ১	পর্যটন ও পর্যটক	৯
অধ্যায় ২	বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও পর্যটন আকর্ষণসমূহ	২০
অধ্যায় ৩	পর্যটক নিরাপত্তা ও স্মার্ট পর্যটন গন্তব্য	৭০
অধ্যায় ৪	টেকসই পর্যটন	৭৯
অধ্যায় ৫	পর্যটন নৈতিকতা	৮৬
অধ্যায় ৬	পর্যটনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারগণ এবং তাদের দায়িত্ব	৯৬
অধ্যায় ৭	পর্যটন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি	১০৭
অধ্যায় ৮	ট্যুরিস্ট পুলিশের গঠন, ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা	১২২
অধ্যায় ৯	পর্যটনে অপরাধ প্রতিরোধ	১২৭
অধ্যায় ১০	ট্যুরিস্ট পুলিশের দক্ষতা উন্নয়ন	১৪৩
অধ্যায় ১১	পর্যটন পরিভাষা	১৪৬

অধ্যায় ১

পর্যটন ও পর্যটক
Tourism & Tourist

পর্যটন

অবসর যাপন, ব্যাবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া, চিকিৎসা, ধর্ম-সহ নানাবিধ উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করাকে পর্যটন বুঝায়। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অনেক দেশে পর্যটন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় ও বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের একটি কার্যকর শিল্পখাত। বর্তমানে পর্যটনের উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ল্যাটিন শব্দ Tornare এবং গ্রীক শব্দ Tornos থেকে Tour শব্দের উৎপত্তি এবং এর সাথে ism (অর্থাৎ action) যুক্ত করে Tourism বা পর্যটন শব্দটি রূপলাভ করেছে। অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংরেজি সাহিত্যে Tourist শব্দটি প্রথম লক্ষ করা যায়। ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘ পর্যটন সংস্থা প্রথম Tourism শব্দটি ব্যবহার করে। অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যটনের একক ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) একটি কারিগরি সংজ্ঞা প্রদান করে। তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী–

'পর্যটন হলো একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ যা ব্যক্তিগত বা ব্যাবসায়িক/পেশাগত উদ্দেশে মানুষের স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে দেশ বা স্থানে চলাচল করে।' 'Tourism is a social, cultural and economic

phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes.' −UNWTO

According to John k. Walton, 'Tourism, the act and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the commercial provision of services.'

এই সংজ্ঞার পাশাপাশি পর্যটন বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ পর্যটন কার্যক্রম ও অবদানকে নানারূপে দেখার চেষ্টা করেছেন। আজকের পৃথিবীতে পর্যটন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, আয় বৃদ্ধি করে, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাড়ায় এবং সর্বোপরি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রাখে। তাই বর্তমান সময়ে পর্যটন একটি সামাজিক প্রথা এবং একই সাথে একটি জীবনধারার অর্থনীতি।

পর্যটক

পর্যটক বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি তার নিজ বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে চাকুরির উদ্দেশ্য ব্যতীত বিশ্রাম, বিনোদন, ব্যাবসা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য অন্যূন ২৪ ঘণ্টা এবং অনধিক ৩৬৫ দিন অবস্থান করেন। তবে দিনে দিনে নিজ বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রে ফেরত আসলে তাকে দর্শনার্থী বলে।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (United Nations World Tourism Organization-UNWTO) পর্যটককে আখ্যায়িত করতে গিয়ে বলেছে, 'যিনি ধারাবাহিকভাবে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে কোনো স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থানপূর্বক স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশে অবসর, বিনোদন বা ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ অন্যান্য বিষয়াদির সাথে জড়িত, তিনি পর্যটকের মর্যাদা উপভোগ করবেন।'

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ২০১০-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'পর্যটক' অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি তাহার স্বাভাবিক বসবাসের স্থান হইতে অন্য কোনো নতুন স্থানে উপার্জনমূলক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ব্যতীত অবকাশযাপন, বিনোদন, ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে বা অন্য যেকোনো কারণে গমন করিয়া অনধিক এক বৎসর অবস্থান করেন।

ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০২০-এর ২(জ) ধারা অনুযায়ী, "পর্যটক অর্থ দর্শনার্থী বা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি তাহার স্বাভাবিক বসবাসের স্থান হইতে অন্য কোনো নতুন স্থানে উপার্জনমূলক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ব্যতীত পরিদর্শন, অবকাশযাপন, বিনোদন, ব্যাবসায়িক প্রয়োজন বা অন্য যেকোনো কারণে গমন করিয়া অনধিক ১ (এক) বৎসর অবস্থান করেন।"

পর্যটনের প্রকারভেদ (Types of Tourism)

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন 'শ্রমঘন এবং সর্ববৃহৎ শিল্প' হিসেবে স্বীকৃত। আর তাই এই শিল্পের রয়েছে বিশাল বিস্তৃতি। পর্যটনের নির্দিষ্ট কোনো প্রকারভেদ নেই। তবে বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পর্যটনের নিম্নরূপ প্রকারভেদ করা যেতে পারে–

ক. গন্তব্যভিত্তিক

অভ্যন্তরীণ পর্যটন (Domestic Tourism)

পর্যটন কর্মকাণ্ড যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সংঘটিত হয় তখন তাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ পর্যটন বা ডমেস্টিক ট্যুরিজম (Domestic Tourism)। অভ্যন্তরীণ পর্যটনের ক্ষেত্রে ভ্রমণার্থী তথা পর্যটকরা নিজ দেশের ভেতরে বিভিন্ন স্থান বা গন্তব্যে গমন করে থাকেন এ ক্ষেত্রে পর্যটকরা অন্য দেশ নয় বরং নিজ দেশের এক বা একাধিক স্থান পরিদর্শন করে থাকেন।

আন্তর্জাতিক পর্যটন (International Tourism)

পর্যটন কর্মকাণ্ড যখন দেশের ভেতরে না হয়ে অন্য দেশে বা বিদেশে সংঘটিত হয় তখন তাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক পর্যটন বা ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম (International Tourism)। আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে ভ্রমণার্থী তথা পর্যটকরা নিজ দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে গমন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পর্যটকরা বিদেশের এক বা একাধিক দেশ ভ্রমণ করতে পারেন।

অন্তর্গামী পর্যটন (Inbound Tourism)

অন্য দেশ বা দেশসমূহ থেকে কোনো একটি দেশে পর্যটক আগমণের ফলে যে পর্যটন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় অন্তর্গামী পর্যটন বা ইনবাউন্ড ট্যুরিজম (Inbound Tourism)। এ ক্ষেত্রে পর্যটকরা দেশের বাইরে থেকে এসে অর্থাৎ অন্যান্য দেশ বা দেশসমূহ থেকে একটি নির্দিষ্ট দেশে প্রবেশ করে তাদের পর্যটন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকেন।

বহির্গামী পর্যটন (Outbound Tourism)

কোনো একটি দেশ থেকে অন্য দেশ বা দেশসমূহে পর্যটক গমনের ফলে যে পর্যটন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় বহির্গামী পর্যটন বা আউটবাউন্ড ট্যুরিজম (Outbound Tourism)। এ ক্ষেত্রে পর্যটকরা নিজ দেশের বাইরে গিয়ে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে অন্য দেশ বা দেশসমূহে গমন করে তাদের পর্যটন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকেন।

খ. কর্মকাণ্ডভিত্তিক

অবকাশ পর্যটন (Leisure Tourism)

কাজের পর বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। আর এই বিশ্রামকালীন সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য মানুষ কোথাও বেড়াতে বা ভ্রমণ করতে গেলে এ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বলা হয় অবকাশ পর্যটন বা লেইজার ট্যুরিজম (Leisure Tourism)। অবকাশযাপন দেশের ভেতরে কিংবা বিদেশে কোনো উল্লেখযোগ্য, আকর্ষণীয়, দর্শনীয় অথবা স্বাস্থ্যসম্মত জায়গায় হতে পারে।

ক্রীড়া পর্যটন (Sports Tourism)

ভ্রমণ কর্মকাণ্ড তথা পর্যটন যখন শুধুমাত্র ক্রীড়াকে ঘিরেই সংঘটিত হয় তখন আমরা তাকে ক্রীড়া পর্যটন বলতে পারি। অর্থাৎ যে ভ্রমণ বাড়ি থেকে দূরে কোথাও ব্যাবসা ব্যতীত শুধুমাত্র খেলাধুলা বিষয়ক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অথবা তা পর্যবেক্ষণের জন্য হয়ে থাকে তাকে ক্রীড়া পর্যটন বলে। বর্তমানে ক্রীড়া পর্যটন খুবই জনপ্রিয় এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক পর্যটন (Cultural Tourism)

কোনো এলাকার মানুষের ভাষা-কৃষ্টি, আচার-অনুষ্ঠান, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, নাট্যকলা ইত্যাদিসহ যে জীবনব্যবস্থা তাই হচ্ছে তাদের সংস্কৃতি বা কলা (Culture)। অথচ এলাকা, অঞ্চল, সমাজ, জাতি তথা দেশ ভেদে এই সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা, তাই নতুন কোনো সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য মানুষের আগ্রহ সেই প্রাচীনকাল থেকেই। অতএব কোনো নতুন সংস্কৃতিকে ঘিরে যে পর্যটন কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় তাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক পর্যটন বা কালচারাল ট্যুরিজম (Cultural Tourism)।

চিকিৎসা পর্যটন (Medical Tourism)

স্বাস্থ্য ভ্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে ভ্রমণে যাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য স্বাস্থ্যগত কারণে অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে মানুষকে দূরে কোথাও যেতে হয়। তাই যখন কোনো ব্যক্তির চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য দূরে অথবা বিদেশে ভ্রমণকালীন সময়ে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অবকাশযাপন, ব্যাবসা বা অন্য কোনো কারণ সম্পৃক্ত থাকার ফলে যে একগুচ্ছ কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয় তাই হচ্ছে চিকিৎসা পর্যটন বা মেডিক্যাল ট্যুরিজম (Medical Tourism)। চিকিৎসা পর্যটন মূলত ব্যয় কমানো, ভিড় এড়ানো, সময় বাঁচানো, উন্নত চিকিৎসা লাভ এবং ভ্রমণের সুযোগ ইত্যাদি কারণে আজকাল খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ধর্মীয় পর্যটন (Religious Tourism)

ধর্ম-কর্মের অংশ হিসেবে মানুষ বেরিয়ে পড়ে তীর্থ যাত্রায়, বিশেষ স্থাপনা পরিদর্শন কিংবা বিশেষ প্রার্থনা সভা তথা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। আর তখনই তাকে ভ্রমণ সহায়ক সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে হয়, যা কি না পর্যটন কর্মকাণ্ড হিসেবে পরিচিত। তাই ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালনের উদ্দেশে যে ভ্রমণ বা পর্যটন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় ধর্মীয় পর্যটন বা রিলিজিয়াস ট্যুরিজম (Religious Tourism)।

শিক্ষা ট্যুরিজম (Educational Tourism)

শিক্ষামূলক পর্যটন হলো নতুন জিনিস শেখা, সংস্কৃতি বা অন্যান্য গন্তব্যের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন জ্ঞান অর্জন। এর প্রধান ফোকাস হলো নতুন জিনিস অধ্যয়ন করা, অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে শেখা, অধ্যয়ন ট্যুর বা অর্জিত দক্ষতা প্রয়োগ করা।

গ. উদ্দেশ্যভিত্তিক

ঐতিহ্য পর্যটন (Heritage Tourism)

ঐতিহ্য পর্যটনকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটনও বলা হয়ে থাকে। কেননা এই পর্যটন স্থান এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় যেগুলো বিশ্বস্ততার সাথে বর্তমান ও অতীত মানুষ এবং বিভিন্ন কাহিনিকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ভ্রমণকারীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সম্পদের পুনরুদ্ধার ও

সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম এমন উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণকে ঐতিহ্য পর্যটন (Cultural Heritage Tourism) বলা হয়ে থাকে।

ইকো-পর্যটন (Eco-Tourism)

ইকো-ট্যুরিজম হলো পর্যটনের একটি ধরন যা প্রাকৃতিক এলাকায় দায়িত্বপূর্ণ ভ্রমণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, ইকো-ট্যুরিজম হলো একান্ত নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের উদ্দেশে বন ও বন্যপ্রাণীর সৌন্দর্য অবলোকন। এটা একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা যার মাধ্যমে দর্শনার্থীরা প্রকৃতির আকর্ষণগুলোকে উপলব্ধি করতে পারেন।

গ্রামীণ পর্যটন (Rural Tourism)

ভ্রমণ শুধু যে গ্রাম থেকে শহরে হয়ে থাকে তা নয়। ভ্রমণ শহর থেকে দূরে অর্থাৎ গ্রামে, আবার গ্রাম থেকে গ্রামেও হয়ে থাকে। এই ভ্রমণের অবশ্যই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে যা তাকে পর্যটন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সেই অর্থে যখন কোনো ভ্রমণ গ্রামীণ জীবনব্যবস্থায় নিজেকে পরিচিত করা কিংবা ব্যাপকভাবে ধারণা লাভ করার জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় গ্রামীণ পর্যটন বা রুরাল ট্যুরিজম (Rural Tourism)।

জনগোষ্ঠী পর্যটন (Community Tourism)

কমিউনিটি ট্যুরিজম হচ্ছে এক ধরনের পর্যটন যার উদ্দেশ্য থাকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মানুষ এবং গ্রামবাসীকে সম্পৃক্ত করা ও তাদেরকে লাভবান করা। অর্থাৎ কমিউনিটি ট্যুরিজম হচ্ছে স্থানীয় জীবনব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি দর্শনার্থীদের সাথে কোনো একটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগাভাগি করা ও এই জনগোষ্ঠীকে টেকসইভাবে লাভবান করা।

সৈকত পর্যটন (Beach Tourism)

সাগরে সৈকত থাকলেও সব সৈকত কিন্তু পর্যটন কর্মকাণ্ডের জন্য উপযোগী নয়। সৈকত হচ্ছে তার থেকে নেমে যাওয়া বালুর স্তর যা পানির সাথে মিশে এক সহাবস্থানের সৃষ্টি করে। আর ওই সৈকতে যখন অবসর সময় কাটানো এবং চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তখন তাকে বলা হয় সৈকত পর্যটন বা বিচ ট্যুরিজম (Beach Tourism)। সৈকতে এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে সাঁতার কাটা, নৌকা নিয়ে ভাসা, জলক্রীড়া, ভলিবল ও চাকতি

নিক্ষেপসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত অবলোকন, মুক্ত বাতাসে অবগাহন, সংগীত ও রকমারি খাবার আয়োজন ইত্যাদি।

ব্লু বা কোস্টাল ট্যুরিজম (Blue or Coastal Tourism)

এই ধরনের ট্যুরিজম মূলত বিচ ট্যুরিজম, স্কুবা ডাইভিং, স্নরকেলিং, ইয়টিং, উপকূলীয় ক্রুজ, সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী এনকাউন্টার এবং প্রবাল প্রাচীর অন্বেষণসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পর্যটকের প্রকারভেদ (Types of Tourists)

সারাবিশ্ব জুড়ে পর্যটকের ছড়াছড়ি। কোটি কোটি পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। আবার পর্যটকদের কম আর বেশি বিচরণ রয়েছে প্রতিটি দেশের এবং অঞ্চলের ভেতরে। তবে এদের মধ্যে নানা কারণে পার্থক্যও রয়েছে বিস্তর। যার ওপর ভিত্তি করে পর্যটকের প্রকারভেদ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আর এসবের মধ্যে রয়েছে–

ক. গন্তব্যভিত্তিক

অভ্যন্তরীণ পর্যটক (Domestic Tourist)

পর্যটকরা যখন নিজ দেশের ভেতরে বিভিন্ন আকর্ষণীয় বা ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি পরিদর্শন করেন বা বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ পর্যটকদের গন্তব্য যখন হয় শুধুমাত্র দেশের ভেতরে।

আন্তর্জাতিক পর্যটক (International Tourist)

পর্যটকরা যখন নিজ দেশের বাইরে বিদেশে বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক বা একাধিক দেশের আকর্ষণীয় স্থান বা ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি পরিদর্শন করেন বা বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ পর্যটকদের গন্তব্য যখন হয় দেশের বাইরে বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

খ. উদ্দেশ্যভিত্তিক

অবকাশযাপনকারী পর্যটক (Leisure Tourist)

পর্যটকরা যখন স্রেফ তাদের অবসর সময় কাটানোর জন্য দেশে অথবা বিদেশে কোনো অবকাশযাপন কেন্দ্রে গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ছুটি কাটানো পর্যটক (Holiday Tourist)

পর্যটকরা যখন স্রেফ তাদের ছুটিকালীন সময়ে দেশে অথবা বিদেশে কোনো গন্তব্য পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

স্বজন পরিদর্শনকারী পর্যটক (Visiting Friends & Relatives Tourist)

পর্যটকরা যখন দেশে অথবা বিদেশে তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন পরিদর্শনের জন্য গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ব্যাবসায়িক পর্যটক (Business Tourist)

পর্যটকরা যখন তাদের ব্যাবসায়িক কাজে দেশে অথবা বিদেশে ভ্রমণ এবং বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ধর্মীয় পর্যটক (Religious Tourist)

পর্যটকরা যখন দেশে অথবা বিদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেমন তীর্থযাত্রা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ কিংবা ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

সাংস্কৃতিক পর্যটক (Cultural Tourist)

পর্যটকরা যখন দেশে অথবা বিদেশে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্থাপনা ইত্যাদি পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ক্রীড়া পর্যটক (Sports Tourist)

পর্যটকরা যখন দেশে অথবা বিদেশে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কিংবা বিশেষ দায়িত্ব পালন অথবা দর্শক হিসেবে গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বিনোদন পর্যটক (Entertainment Tourist)

পর্যটকরা যখন দেশে অথবা বিদেশে কোনো বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন প্রযুক্তি (লেজার, সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো) কিংবা সঙ্গীত কিংবা স্থির ও চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, উৎসব, মেলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ কিংবা দর্শক হিসেবে গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

পরিবেশ পর্যটক (Eco-tourist)

পর্যটকরা যখন দেশে অথবা বিদেশে কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিশেষ বনাঞ্চল, জলপ্রপাত, অভয়ারণ্য, পাহাড়ি উদ্যান ইত্যাদি পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চিকিৎসা পর্যটক (Medical Tourist)

পর্যটকরা যখন দেশে অথবা বিদেশে হ্রাসকৃত মূল্য অথবা বিশেষ উন্নত চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য গিয়ে বিভিন্ন পর্যটন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

উদ্দেশ্যভিত্তিক পর্যটক অবশ্য আরও আছেন। তবে এরাই হচ্ছেন এ ধরনের পর্যটকদের মধ্যে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, প্রধান উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক এর বাইরেও পর্যটকরা অন্যান্য অনেক কিছুতে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং এটাই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের একজন পর্যটক উন্নত চিকিৎসাসেবা নিতে সিঙ্গাপুর গেলেন এবং এটা তার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে দেখা গেল দেশে ফেরার আগে তিনি বিখ্যাত কোনো পার্ক বেড়াতে কিংবা স্টার ক্রুজে যেতে ভোলেননি।

পর্যটক সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয় (Tourist Related Other Matters)

পর্যটন শিল্পের মূল অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যটক। অর্থাৎ তাকে ঘিরেই পর্যটন কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়ে থাকে। তাই পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন হোক আর পর্যটন সেবার আয়োজন হোক সবই কিন্তু পর্যটকের উদ্দেশে। এবার উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে পর্যটকের সঙ্গে পর্যটনের সখ্যের সুযোগ করে দিতে হয়েছে। এতে পর্যটকের সঙ্গে যে যে বিষয়গুলো সম্পৃক্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে–

পর্যটক গন্তব্য (Tourist Destination)

পর্যটকরা যেসব স্থান বা আকর্ষণ পরিদর্শন করে দেখা ও জানার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা এবং সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হন তাই হচ্ছে পর্যটক গন্তব্য বা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন (Tourist Destination)। পর্যটক গন্তব্যকে বলা যেতে পারে পর্যটন কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল। কারণ পর্যটক গন্তব্যে পর্যটকরা তাদের পরিদর্শন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নানা ধরনের পর্যটন সেবাও গ্রহণ করে থাকেন।

পর্যটক আগমন (Tourist Arrival)

পর্যটকদের লক্ষ্যবস্তু বা যে গন্তব্য তারা পরিদর্শনে যান সেখানে তাদের উপস্থিতিই হচ্ছে পর্যটক কর্মকাণ্ডের প্রধান এবং প্রারম্ভিক বিষয়। অর্থাৎ কোনো পর্যটক গন্তব্যে পর্যটকরা পৌঁছার পরই কেবল পর্যটক আগমনের ব্যাপারটি নিশ্চিত হয় এবং তাদের

কর্মতৎপরতা বা পর্যটন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। তাই নির্দিষ্ট কোনো পর্যটক গন্তব্যে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের উপস্থিতিকেই বলা হয় পর্যটক আগমন বা ট্যুরিস্ট অ্যারাইভাল (Tourist Arrival)।

পর্যটক আকর্ষণ (Tourist Attraction)

পর্যটক যে গন্তব্যে যাবেন সেখানকার কোনো বিশেষ স্থান, স্থাপনা, ঘটনা বা বিষয় ইত্যাদি যা কিছু তাকে আকৃষ্ট করে তথা ভ্রমণে যেতে উৎসাহিত করে তাই হচ্ছে পর্যটক আকর্ষণ বা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন (Tourist Attraction)। পর্যটক আকর্ষণ মূলত পরিবেশ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সৌন্দর্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি নির্ভর হয়ে থাকলেও আজকাল প্রচারগুণে অনেক সাধারণ কিছুও পর্যটককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হচ্ছে।

পর্যটক কেন্দ্র (Tourist Centre)

পর্যটকদের জন্য যানবাহন, থাকা-খাওয়া, সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ, বিনোদন, কেনাকাটা ইত্যাদি সরবরাহের প্রয়োজন পড়ে, যা পর্যটকরা তাদের নিজেদের অর্থ দিয়েই ক্রয় করে থাকেন। যে স্থানটিতে পর্যটকদের উপস্থিতি থাকে এবং পর্যটকরা তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা সার্বক্ষণিকভাবে ও ন্যায্যমূল্যে পেয়ে থাকেন তাকে বলা হয় পর্যটক কেন্দ্র বা ট্যুরিস্ট সেন্টার (Tourist Centre)।

পর্যটক মৌসুম (Tourist Season)

আবহাওয়াজনিত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটক আগমনেরও তারতম্য হয়ে থাকে। তাছাড়া নানা কারণে অনেক দেশের পর্যটকরাও তাদের পছন্দ মতো সময়ে ভ্রমণে যেতে পারেন না। তাই বছরের যে নির্দিষ্ট সময় বা মাসগুলোতে কোনো একটি পর্যটক গন্তব্যে স্বাভাবিক পর্যটক আগমন ঘটে থাকে সেই সময়কালকে বলা হয় পর্যটক মৌসুম বা ট্যুরিস্ট সিজন (Tourist Season)।

পর্যটক গাইড (Tourist Guide)

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন ব্যক্তি যিনি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কোনো আকর্ষণীয় স্থানে বা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দেন, ঘুরে-ঘুরে সবকিছু দেখান বা পরিচিত করান, বিভিন্ন উত্তর দান করেন, সময় ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তাৎক্ষণিক নানা সমস্যার সমাধান করেন, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা দেখভাল করেন তাকে বলা হয় পর্যটক গাইড বা ট্যুরিস্ট গাইড (Tourist Guide)।

পর্যটক তথ্য (Tourist Information)

ভ্রমণের ক্ষেত্রে তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভোক্তা বা পর্যটক তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য তথা পণ্য ও সেবা কাছে পৌঁছার জন্য এর ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তাই পর্যটককে নানান আকর্ষণীয় স্থান বা গন্তব্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, গন্তব্যে পৌঁছা, গন্তব্যের সার্বিক অবস্থা, থাকা-খাওয়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা, ব্যাংক ও কেনাকাটার সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তাই হচ্ছে পর্যটক তথ্য বা ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন (Tourist Information)।

পর্যটক ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র (Tourist Digital Information Centre)

দেশি-বিদেশি পর্যটকরা তাদের ভ্রমণ শুরুর প্রাক্কালে কিংবা ভ্রমণকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এসবের মধ্যে আকর্ষণীয় স্থান বা গন্তব্য, এর অবস্থান ও দূরত্ব, আবহাওয়া, যোগাযোগ, আবাসন, খাবার-দাবার, বিনোদন, কেনাকাটা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি তথ্য অন্যতম। তাই পর্যটকরা তাদের ভ্রমণকে আরও স্বার্থক, সুন্দর ও ঝামেলা মুক্ত করার জন্য যে অ্যাপস, ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে প্রয়োজনীয় এবং সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে তাকে বলা হয় পর্যটক ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র বা ট্যুরিস্ট ডিজিটাল ইনফরমেশন সেন্টার (Tourist Digital Infromation Centre)।

পর্যটক ভিসা (Tourist Visa)

ভিসা হচ্ছে একটি দেশের ভূ-সীমানার প্রবেশদ্বারের অভিবাসন কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে ওই দেশে কোনো ব্যক্তির প্রবেশাধিকার দিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ডকুমেন্ট বা দলিল। ভিসা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন ট্যুরিস্ট ভিসা, বিজনেস ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা, পিলগ্রিম ভিসা, ইমিগ্র্যান্ট ভিসা, ডিপ্লোম্যাট ভিসা ইত্যাদি। তবে একটি দেশে নির্দিষ্ট সময় এবং কিছু শর্তসাপেক্ষে শুধুমাত্র পরিদর্শক হিসেবে প্রবেশের জন্য কোনো ব্যক্তিকে অধিকার দিয়ে ওই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে ডকুমেন্ট বা দলিল ইস্যু করে তাকে বলা হয় পর্যটক ভিসা বা ট্যুরিস্ট ভিসা (Toursit Visa)।

অধ্যায় ২

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও পর্যটন আকর্ষণসমূহ

Culture of Bangladesh & Tourism Attractions

বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস

বাংলাদেশের বাঙালিদের রয়েছে শত শত বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা অঞ্চলের রয়েছে স্বকীয় ঐতিহ্য এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। বাংলা ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে ধনী অঞ্চল ও তৎকালীন সময়ের উপমহাদেশীয় রাজনীতি এবং সংস্কৃতির রাজধানী। এছাড়াও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীও রয়েছে। এখনো বাংলা দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং বাংলা সংস্কৃতির উৎসবগুলো পৃথিবীব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়। বাঙালি সংস্কৃতি ধর্মীয় ও জাতীয় দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের সংমিশ্রিত সংস্কৃতিতে ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব রয়েছে। এটি সংগীত, নৃত্য, নাটক, শিল্প নৈপুণ্য, লোককাহিনি, লোককথা, ভাষাসাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, উৎসব উদ্‌যাপন, স্বতন্ত্র রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়।

জনপদের ইতিহাস

২০০৬ সালের উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাকীর্তির নিদর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছিল প্রায় ৪,০০০ বছর আগে। ধারণা করা হয়, দ্রাবিড় ও তিব্বতীয় বর্মী জনগোষ্ঠী এখানে সে সময় বসতি স্থাপন করেছিল। এরপর স্থানীয় ও বিদেশি শাসক, গুপ্ত রাজবংশ এই দেশকে শাসন করে। অতঃপর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী

পাল রাজবংশ প্রায় ৪০০ বছর শাসন করে। এরপর হিন্দুধর্মাবলম্বী সেন রাজবংশ এবং ১২শ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রবর্তন ঘটে। ১৬শ শতকে বাংলা আসে মোগলদের শাসনাধীনে। তারপর ব্রিটিশ শাসকরা প্রায় ২০০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর পাকিস্তানি শাসকরা শাসন করে ২৫ বছরের জন্য। সবশেষে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা পাই স্বাধীন বাংলাদেশ।

বাংলা সাহিত্য

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোহা-সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও তিনটি গ্রন্থের সঙ্গে চর্যাগানগুলো নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থের নাম দেন 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা'। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়কার বাংলা সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরোনো। ৭ম শতাব্দীতে লেখা বৌদ্ধ দোহার সংকলন চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য, লোকগীতি ও পালাগানের প্রচলন ঘটে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

বাঙালি নারীদের প্রধান পোশাক শাড়ি আর পুরুষদের লুঙ্গি, ধুতি, পাঞ্জাবি। এছাড়া উপজাতীয়রা নিজেদের পোশাকও ব্যবহার করেন। প্রাচীন বাংলায় সেলাই করা পোশাক অপবিত্র বলে মনে করা হতো। বাংলায় মুসলমান শাসকদের আগমনের পর সেলাই করা পোশাক যেমন গোল জামা ও মধ্য এশিয়া থেকে মোগল শাসকদের দ্বারা আনা সালোয়ার-কামিজ বাঙালি নারীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুরোনো আমলে জামা সাধারণত বাংলা রেশম বা মসলিনের হতো। জারদোজি, গোটা ও পাথর ব্যবহার করা ভারী কাজের জামা জনপ্রিয় ছিল।

বাংলা সংগীত

বাউল, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, গম্ভীরা, কবিগান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একতারা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বাংলার নাচের সংস্কৃতি অতিপ্রাচীন। ক্লাসিক্যাল, ফোক এবং বাদ্যায়িত নাচের প্রচলন রয়েছে। এর মধ্যে উপজাতীয় নৃত্য, লোকজ নৃত্য, শাস্ত্রীয়

নৃত্য অন্যতম। দেশের গ্রামাঞ্চলে যাত্রাপালার প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশে রান্না-বান্নার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ভাত, মাছ ও ডাল এখানকার প্রধান খাদ্য। এ দেশের পুরুষদের প্রধান পোশাক লুঙ্গি এবং নারীদের প্রধান পোশাক শাড়ি।

ঐতিহ্য

বাংলাদেশের রয়েছে অসাধারণ ঐতিহ্য। সংগীত, শিল্পকলা, লোকজ চিকিৎসা, আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য, প্রকৃতি, প্রত্নতত্ত্ব, জীবনধারা ইত্যাদি সমৃদ্ধ করেছে এ দেশের ঐতিহ্যের ভান্ডারকে। ফলে এরই মধ্যে ইউনেস্কো আমাদের সুন্দরবন, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, নওগাঁর সোমপুর মহাবিহার, বাউল সংগীত এবং জামদানি শাড়ির ডিজাইনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠান ও আকর্ষণ

সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে অগণিত গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠান। বাঙালির বিয়ে, অন্নপ্রাশন, নাইয়র, সাধ (মেয়ের সন্তান ধারণের সাত মাসে বাবার বাড়িতে এনে একটি অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে একে সাধ বলে), চৈত্র সংক্রান্তি, মৃত্যু পরবর্তী ধর্মীয় ও সামাজিক আচার ইত্যাদি আমাদের সমাজে বর্তমান। এ সকল অনুষ্ঠান স্থানীয় জনগোষ্ঠী যে উৎসাহ নিয়ে আয়োজন করে তা যেকোনো পর্যটকদের জন্য নতুন আকর্ষণ হতে পারে।

স্থানীয় খাদ্য ও পানীয়

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ ও ডাল। দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনের ফলে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পড়েছে তাদের বেশ কিছু প্রভাব। ব্রিটিশরা নানা ধরনের খাদ্য প্রবর্তন করে তাদের ২০০ বছরের শাসনামলে। ইহুদিরা নিয়ে আসে বেকারি পণ্য, মারোয়ারিরা আনে মিষ্টির নানান পদ, মোগল খাবারের সন্নিবেশ ঘটান টিপু সুলতান। এই সকল খাদ্য পরবর্তীতে আমাদের মূল খাদ্যতালিকার সাথে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগতভাবে এখানে অনেক ধরনের পিঠার প্রচলন রয়েছে। পানীয় বলতে সারাদেশেই পানীয় জল ব্যবহারে অভ্যস্ত এখানকার মানুষ। তবে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ডাব, শীতে খেজুরের রস এবং নানা ধরনের শরবত ইত্যাদি পান করতে পছন্দ করেন বাংলাদেশের মানুষ। বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ।

মেলা ও উৎসব

বৈশাখী উৎসব, নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, সাপুড়ের সাপের খেলা, গ্রামীণ বারণি, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি চিরায়ত আচার-অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহ

বাংলাদেশে রয়েছে প্রাকৃতিক ও মনুষ্য নির্মিত বহুবিধ পর্যটন সম্পদ। এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত পর্যটন সম্পদের পরিমাণই বেশি। বিশাল জলাভূমির দেশ বাংলাদেশ। এখানে প্রায় ২৪০০ কি.মি. দীর্ঘ নদীপথ এবং বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় এক-ষষ্ঠমাংশ হাওড় এলাকা আছে। ফলে জলপর্যটন সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর আমাদের এই ভূখণ্ড। অধিকন্তু প্রচুর প্রত্নসম্পদ আছে বাংলাদেশে। নিচে বাংলাদেশের পর্যটন সম্পদসমূহের একটি শ্রেণিবিন্যাস উপস্থাপন করা হলো।

প্রাকৃতিক পর্যটন সম্পদ

সুন্দরবন, কক্সবাজারের, টেকনাফ, পতেঙ্গা, আনোয়ারা এবং কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ, আলুটিলার গহ্বর (খাগড়াছড়ি), চিম্বুক ও কেওক্রাডং পাহাড় (বান্দরবান), মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত (সিলেট), সীতাকুণ্ডের গরম জলের প্লাবন, লাউয়াছড়া ও সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, গাজীপুরের জাতীয় উদ্যান, লাউয়াচাপড়া, মধুটিলা (ময়মনসিংহ), মাধবপুর বন ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক পর্যটন সম্পদ

ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠান, যেমন ঈদ, পূজা, বাংলা নববর্ষ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস, খেলাধুলা, মানুষের আতিথেয়তা ও বিশেষ কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান।

ধর্মীয় পর্যটন

ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে মুসলমানদের ঈদ, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং খ্রিষ্টানদের বড়োদিন অন্যতম। এছাড়া সর্বজনীন উৎসবের মধ্যে রয়েছে পহেলা বৈশাখ ও নবান্ন উৎসব।

জাতীয় দিবস কেন্দ্রিক পর্যটন

জাতীয় দিবস হিসেবে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শোক দিবস অন্যতম।

মনুষ্য নির্মিত পর্যটন সম্পদ

মনুষ্য নির্মিত পর্যটন সম্পদে মোট চার ধরনের স্থাপনা দেখা যায়। যেমন, প্রাচীন স্থাপনা, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, জাদুঘর বা আর্ট গ্যালারি এবং থিম পার্ক। পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও গোকুলমেধ, দিনাজপুরের কান্তজিউ

মন্দির, কুমিল্লার শালবন বিহার, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, রাজশাহীতে পুঠিয়ার হিন্দু মন্দির, নাটোরের উত্তরা গণভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, পুরান ঢাকার ছোটো ও বড়ো কাটরা, শাঁখারীবাজার, লালবাগ দুর্গ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, গুরুনানক শাহী, আর্মেনিয়ান চার্চ, সংসদ ভবন, বাহাদুর শাহ পার্ক, সোনারগাঁও, চট্টগ্রামের কাপ্তাই ও ফয়'স লেক, সিলেটের চা বাগান ইত্যাদি।

প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন (Archaeological Tourism)

বাংলাদেশ আয়তনে ছোটো দেশ হলেও এখানে ছড়িয়ে আছে ছোটো-বড়ো অজস্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, যা আমাদের সভ্যতার প্রকৃত নির্ণায়ক। এদের মধ্যে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, নওগাঁর পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর মহাবিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর, পঞ্চগড়ের ভিতরগড়, কুমিল্লার শালবন বিহার, মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর বিহার বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। এ সকল প্রত্নসম্পদ ছাড়াও রয়েছে অনেক কম পরিচিত এবং অনুদ্‌ঘাটিত প্রত্নসম্পদ এবং প্রত্নজাদুঘর যেমন পুরান ঢাকার লালবাগ দুর্গ ও আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ, রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা ও আঠারবাড়ী জমিদার বাড়ি ইত্যাদি। এই সকল মূল্যবান প্রত্ননিদর্শন নিয়ে অনেক আগে থেকেই গড়ে উঠেছে একটি সুগঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন।

কৃষি পর্যটন (Agritourism)

কৃষি আমাদের জীবন, জীবিকা ও অস্তিত্বের সাথে জড়িত। সারা বাংলাদেশ যেন এখনো একটি খামার, যাতে চাষ হয় বহু ধরনের ফসল, ফল, ঔষধীগাছ, মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি। বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় কৃষি আমাদের প্রাচীনতম সংস্কৃতি। কৃষির মৌলিক অবয়ব, কৃষি কৌশল, চিরায়ত লাগসই সংরক্ষণ পদ্ধতিসহ কৃষকদের সকল কর্মকাণ্ড এবং তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে অনন্য কৃষি পর্যটন। কৃষির নানা শাখাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের একেকটি স্থান হতে পারে কৃষি পর্যটনের একেকটি গন্তব্য। অবদানের কথা বিবেচনা করে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে একে অন্যতম প্রধান পর্যটন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। টেকসই কৃষির চর্চা ও বিকাশের জন্য মূল্য সংযোজিত কৃষিপণ্য এবং কৃষি পর্যটন বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কৃষকের খামার থেকে পর্যটক কর্তৃক সরাসরি পণ্য ক্রয় এই পর্যটনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় বাংলাদেশেও এটি হতে পারে আমাদের অন্যতম প্রধান পর্যটন।

জলাভূমি পর্যটন

বাংলাদেশ প্রধানত নদী-পানির দেশ। এখানে রয়েছে প্রায় ২৪,০০০ কি.মি. দীর্ঘ ৮০০টি নদ-নদী যার অনেকটাই নিঃশেষ হয়ে এখন অবশিষ্ট আছে ৯,০০০ কি.মি.। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও অনেক ছোটো ছোটো নদ-নদী এখনো আমাদের পর্যটনের অনেক বড়ো সম্পদ। যেমন ঢাকার শীতলক্ষ্যা, নেত্রকোণার সোমেশ্বরী, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী কিংবা যশোরের চিত্রা নদী এখনো পর্যটকদেরকে বেশ আকর্ষণ করে। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণভাগে প্রায় ৭০০ কি.মি. দীর্ঘ সমুদ্রতীর রয়েছে। এত বিশাল সমুদ্রতীর সঠিক ব্যবস্থাপনা ও প্রচারের আওতায় আনতে পারলে আমাদের পর্যটনের নিজস্ব অবয়ব ভিন্নরূপ হবে। এছাড়া বাংলাদেশে রয়েছে ৮০০ বর্গ কি.মি. আয়তনের ৩৭৩টি হাওড় যা ৫৯টি উপজেলায় বিস্তৃত। এই হাওড় আমাদের আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী পর্যটন সম্পদ। অধিকন্তু নদী-নালা-সমুদ্রবেষ্টিত সুন্দরবন, হাকালুকি হাওড়, বাইক্কা বিল ইত্যাদিসহ অনেক অজানা ছোটো-বড়ো জলাশয় রয়েছে যেগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে জলাভূমি পর্যটন।

পাহাড় ও আদিবাসী পর্যটন

মানুষ প্রকৃতির সন্তান, তাই প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া তার স্বভাবসিদ্ধ কাজ। পাহাড়, নদী, সমুদ্র মানুষকে নিরন্তর টানে। পর্যটক হয়ে মানুষ সেখানে যায় তার মনের ও জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করতে। আমাদের দেশে ৩টি পার্বত্য জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ এবং সিলেটে কিছু পাহাড় আছে। বিশেষভাবে বান্দরবানের কেওক্রাডং, তাজিনডং, মোলক এবং ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের প্রতি পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ আছে। অন্যদিকে পাহাড় ও সমতলে রয়েছে কমপক্ষে ৩৫ ধরনের আদিবাসী এদের মধ্যে সিলেটের মণিপুরী, বান্দরবানের চাকমা, ম্রো ইত্যাদি আদিবাসী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং জীবনধারা পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ। পাহাড় ও আদিবাসী আমাদের অন্যতম পর্যটন সম্পদ, যা দেখার জন্য দেশীয় ও বিদেশি সব ধরনের পর্যটকদেরই ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক পর্যটন (Ethnic Tourism)

বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ছাড়া এ দেশে রয়েছে ৪৫টি আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এদের মধ্যে মণিপুরী, চাকমা, মারমা, ম্রো, খেয়াং, মান্দি, তনচঙ্গা, সাঁওতাল, ওরাও, হাজং, রাজবংশী, লুসাই, বম, খুমি ও মুন্ডা অন্যতম। প্রত্যেকটি নৃ-গোষ্ঠী একে অন্যের চাইতে আলাদা। প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্ট সামাজিক রীতি-নীতি

মেনে চলে। জাতিসংঘ তাদের ২০০৭ সালের ঘোষণাপত্রে যেকোনো দেশের এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে Indeginous People বলে অভিহিত করেছে। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা এসব নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা স্থানীয় ও বিদেশি সকল পর্যটকদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ। সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসব জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ নৃতাত্ত্বিক পর্যটন। আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য উৎসব সংশ্লিষ্ট পর্যটন নিম্নরূপ–

বিজু: চাকমাদের সবচেয়ে বড়ো জাতিগত উৎসব। বাংলা বছরের শেষ দুদিন ও নতুন বছরের প্রথম দিন এ উৎসব পালন করা হয়। বাংলা বছরের শেষ দিনের আগের দিনকে বলা হয় ফুল বিজু এবং শেষ দিনকে বলা হয় চৈত্র সংক্রান্তি বা মূল বিজু। মূল বিজুর দিন সকালবেলা চাকমারা ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজায়, বুড়ো-বুড়িদের গোসল করায় এবং তাদেরকে নতুন কাপড় দেয়। রাতে বসে পরের দিনের পাচন তরকারি রান্নার জন্য সবজি কাটতে বসে যা কমপক্ষে ৫টি এবং বেশি হলে ৩২ রকম সবজির মিশেলে রান্না করা হয়। পরের দিন মূল বিজু, এদিন চাকমা তরুণ-তরুণীরা খুব ভোরে উঠে কলাপাতায় করে কিছু ফুল গঙ্গার উদ্দেশে নদীর পাড়ে দেওয়া হয়। তারপর সবাই বিশেষ করে ছোটোরা নতুন জামা-কাপড় পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে থাকে। তবে গ্রামগুলোতে প্রাচীনকালের মতো করে 'ঘিলে হারা' (খেলা) হয়। পরের দিন নতুন বছর বা গয্যে পয্যে, নতুন বছরের দিন সবাই বৌদ্ধ মন্দিরে যায়, খাবার দান করে, ভালো কাজ করে, বৃদ্ধদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেয়। চাকমা লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধশালী। তাদের লোককাহিনিকে বলা হয় উবগীদ। চাকমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র অনেক সমৃদ্ধ। আর বয়নশিল্পে চাকমা রমণীদের সুখ্যাতি জগৎ জুড়ে। ইদানীং বিজুতে র‍্যালি করা হয়। দেশ-বিদেশের অনেক লোক বিজু র‍্যালিতে যোগ দেওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে।

সাংগ্রাই: মারমাদের নববর্ষ উৎসবের নাম সাংগ্রাই। এটি তাদের অন্যতম প্রধান একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখকে উপলক্ষ্য করেই তারা এই উৎসবের আয়োজন করে। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে তারা সাংগ্রাইয়ে আকর্ষণীয় নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পানিখেলা সেসব অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। ওই দিন মারমা তরুণ-তরুণীরা একে অপরের প্রতি পানি ছিটিয়ে আনন্দ করে। পানি ছেটানোর মাধ্যমে তারা বিগত বছরের গ্লানি ও কালিমা ধুয়ে-মুছে দূর করে। তাছাড়া পানিখেলার মাধ্যমে তারা পছন্দের মানুষটিকেও

খুঁজে নেয়। পানিখেলা ছাড়াও তারা পাংছোয়াই (ফুল সাংগ্রাই), সাংগ্রাই জীঈ, মোমবাতি প্রজ্বলন এবং বুদ্ধানের মতো অন্যান্য অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সাংগ্রাই উৎসব উদ্‌যাপন করে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পর্যটন সম্পদ

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

কক্সবাজার, যার প্রাচীন নাম 'পালংকি', চট্টগ্রাম থেকে ১৫০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। কক্সবাজার নামটি আসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স (Hiran Cox)-এর নাম থেকে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সদর উপজেলায় অবস্থিত ১২০ কি.মি. দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বালুকাময় সৈকত। বর্তমান সময়ে এটি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন গন্তব্য। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হওয়া সত্ত্বেও প্রচারণার অভাবে এবং সরাসরি আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগ না থাকার জন্য এটি আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য কষ্টসাধ্য। তবে স্থানীয় পর্যটকদের চাহিদা পূরণের জন্য এখানে নির্মিত হয়েছে ৩ শতাধিক হোটেল-মোটেল, রিসোর্ট ও স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। কক্সবাজারের নিকটবর্তী কয়েকটি পর্যটন গন্তব্য শেমন রামু, মহেশখালী দ্বীপটি ২৬৮ বর্গ কি.মি. যাতে রয়েছে আদিনাথ ও বৌদ্ধ প্যাগোডা। টেকনাফ নাফ নদীর তীরে অবস্থিত কক্সবাজার জেলার শেষ সীমানা। নাফ নদী পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। এই নদী পেরিয়ে পর্যটকরা সেন্ট মার্টিন দ্বীপে গমনাগমন করেন।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার

সেন্ট মার্টিন কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার আওতাধীন ৫ বর্গ কি.মি. দৃশ্যমান ভূমিতে ১২ বর্গ কি.মি. সম্প্রসারিত শক্ত কোরাল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমান করা হয় যে, প্রায় ১০ লক্ষ বছর লেগেছে দ্বীপটি তৈরি হতে। উত্তর-দক্ষিণে এই স্থানীয় নাম 'নারিকেল জিনজিরা' অর্থাৎ 'নারিকেল দ্বীপ'। প্রচুর নারিকেল বলেই স্থানীয়রা একে এই নামে ডাকে। এই দ্বীপটি পৃথিবীর এক বিরল কোরাল দ্বীপ। এখানে রয়েছে ১০৪ প্রজাতির অপুষ্পক উদ্ভিদ, ১৫২ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ২৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ২১৫ প্রজাতির মৎস্য জাতীয় প্রাণী, ৮৫ ধরনের পাখি এবং ১৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। সৈকত জীবনচক্রে একটি দ্বীপের যেভাবে এবং যে সময়ের পরে পরিবর্তিত হওয়ার কথা, তার অনেক পূর্বেই এই ধাপটি হুমকির মুখে পড়েছে। কেননা অপরিকল্পিতভাবে অব ও উপরিকাঠামো নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করাসহ নানামুখী কর্মসম্পাদনের ফলে আজ আশঙ্কার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

এরই মধ্যে দক্ষিণাংশের অর্ধেকেরও বেশি এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবেশবাদী ও পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্তরা তৎপর এই অমূল্য দ্বীপটিকে সুরক্ষার জন্য। আজকের দিনে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পর্যটকদের কাছে এক বিরাট আকর্ষণ। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রগামী জাহাজে কিছুটা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে যেতে হয়েছে বলে ডিসেম্বর থেকে মার্চ এই দ্বীপ ভ্রমণের উত্তম সময়। পর্যটকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক হোটেল ও রিসোর্ট। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এই দ্বীপে গণপর্যটন পরিচালিত হলে দ্বীপটি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে।

সোমপুর মহাবিহার, নওগাঁ

সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করেছিলেন। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। ১৯১৯ সালে একে পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের মর্যাদা দেয়। এই বিহার বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। তাই এটি 'পাহাড়পুর বিহার' নামেও পরিচিত। বৌদ্ধ বিহারটি চতুষ্কোণাকার এবং চারদিক চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা। উত্তর দিকের বাহুতে ৪৫টি এবং অপর ৩ বাহুতে ৪৪টি করে মোট ১৭৭টি ছোটো ছোটো কক্ষ রয়েছে। এগুলো ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসকক্ষ। তবে পরবর্তীকালে কিছু কক্ষকে প্রার্থনাকক্ষে রূপান্তর করা হয়।

বিহারের উন্মুক্ত চত্বরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তিনটি ক্রমহ্রাসমান ধাপে ঊর্ধ্বগামী এ মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা ক্রুশাকার। মূল পরিকল্পনাটির কেন্দ্রে দরজা-জানালাবিহীন একটি শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণাকার প্রকোষ্ঠ আছে, যা মন্দিরের তলদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাহাড়পুর মহাবিহার পর্যটক, গবেষক ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। প্রতিদিন শত শত দেশি-বিদেশি পর্যটক এই মহাবিহার দর্শন করছেন।

কান্তজিউ মন্দির, দিনাজপুর

কান্তজিউ মন্দিরটি দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার কান্তনগর গ্রামে অবস্থিত। জানা যায়, দিনাজপুরের তৎকালীন মহারাজা প্রাণনাথ তার শেষ বয়সে মন্দিরের নির্মাণ শুরু করেন। ১৭২২ সালে তার মৃত্যু হলে তার পোষ্যপুত্র মহারাজা রামনাথ ১৭৫২ সালে শেষ করেন। শুরুতে মন্দিরের উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। এটি

নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত। কারণ তিন তলাবিশিষ্ট এই মন্দিরের নয়টি চূড়া বা রত্ন ছিল। ১৮৯৭ সালের এক ভূমিকম্পে মন্দিরের চূড়াগুলো ভেঙে যায়। তৎকালীন মহারাজা গিরিজানাথ মন্দিরের ব্যাপক সংস্কার করলেও চূড়াগুলো সংস্কার করা হয়নি। এটি টেরাকোটা স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। কান্তজিউ মন্দির দিনাজপুর শহর থেকে ১২ কি.মি. দূরে ঢেঁপা নদীর তীরে অবস্থিত।

মন্দিরের বাইরের দেয়ালজুড়ে পোড়ামাটি ফলকে (Terracota) লেখা রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি। পুরো মন্দিরে প্রায় ১৫,০০০ পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। ওপরে তিন ধাপে উঠে গেছে মন্দিরটি। মন্দিরের চারিদিকের সবগুলো খিলান দিয়েই ভেতরের দেবমূর্তি দেখা যায়। মন্দিরটি পাথরের ভিত্তির ওপর ৫০ ফুট উচ্চতায় বর্গাকার আয়তনের। নিচ তলার সব প্রবেশ পথে বহু খাঁজযুক্ত খিলান রয়েছে। মন্দিরের নিচতলায় ২১টি, দ্বিতীয় তলায় ২৭টি এবং তৃতীয় তলায় ৩টি দরজা-খিলান রয়েছে। কান্তজিউ মন্দির বাংলাদেশের একটি অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ।

লালবাগ দুর্গ, ঢাকা

লালবাগ কেল্লা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে লালবাগে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ। মোগল আমলে স্থাপিত এই দুর্গটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটনস্থল। প্রথমে এই কেল্লার নাম ছিল কেল্লা আওরঙ্গবাদ। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ৩য় পুত্র আজম শাহ ১৬৭৮ সালে ঢাকার সুবেদারের বাসস্থান হিসেবে এই কেল্লার নির্মাণকাজ শুরু করেন। কেল্লার নকশাও তিনিই করেন। কিন্তু মাত্র এক বছর পর কেল্লার নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই মারাঠা বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্রাট তাকে দিল্লি ডেকে পাঠান। একটি মসজিদ ও দরবার হল নির্মাণের পর দুর্গ নির্মাণের কাজ থেমে যায়। নবাব শায়েস্তা খান ১৬৮০ সালে ঢাকায় এসে পুনরায় দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তবে শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির মৃত্যুর পর এই দুর্গকে অপয়া বলে মনে করা হয় এবং শায়েস্তা খান ১৬৮৪ সালে এর নির্মাণ বন্ধ করে দেন। এই পরী বিবির সাথে শাহজাদা আজম শাহের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পরী বিবিকে দরবার হল ও মসজিদের ঠিক মাঝখানে সমাহিত করা হয়। শায়েস্তা খান দরবার হলে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। ১৬৮৮ সালে শায়েস্তা খান অবসর নিয়ে আগ্রা চলে যাওয়ার সময় দুর্গের মালিকানা উত্তরাধিকারীদের দিয়ে যান। শায়েস্তা খান ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নানা কারণে লালবাগ দুর্গের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৮৪৪ সালে ঢাকা কমিটি নামে একটি

আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্গের উন্নয়ন কাজ শুরু করে। এ সময় দুর্গটি লালবাগ দুর্গ নামে পরিচিতি লাভ করে। কেল্লা চত্বরে ৩টি স্থাপনা রয়েছে।

- কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মামখানা
- পরী বিবির সমাধি এবং
- উত্তর-পশ্চিমাংশের শাহী মসজিদ

ঢাকেশ্বরী মন্দির, ঢাকা

ঢাকেশ্বরী মন্দির ঢাকা শহরের পলাশী ব্যারাক এলাকায় ঢাকেশ্বরী রোডে অবস্থিত। এর নামকরণ করা হয়েছে 'ঢাকার ঈশ্বরী' অর্থাৎ ঢাকা শহরের রক্ষাকর্ত্রী হতে। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। ধারণা করা হয় যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন ১২শ শতাব্দীতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সেই সময়কার নির্মাণশৈলীর সাথে এর স্থাপত্যকলার মিল পাওয়া যায় না বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। বিভিন্ন সময়ে এই মন্দিরের গঠন ও স্থাপনার নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

মূল মন্দির এলাকার ভবনগুলো উজ্জ্বল হলুদাভ ও লাল বর্ণের। মূল মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে ৪টি শিব মন্দির। মূল মন্দিরটি পূর্বাংশে অবস্থিত। এখানে দেবী দুর্গার একটি ধাতু-নির্মিত প্রতিমা রয়েছে।

আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ, ঢাকা

আহসান মঞ্জিল পুরান ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা আহসানুল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। এই ভবনের নির্মাণকাল ১৮৫৯-১৮৭২ সালে।

ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পরগণার জমিদার শেখ ইনায়েত উল্লাহ্ আহসান বর্তমান স্থানে 'রংমহল' নামে একটি প্রমোদভবন তৈরি করেন। পরে তার পুত্র রংমহলটি এক রাসি বণিকের কাছে বিক্রয় করে দেন। নওয়াব আবদুল গণির পিতা সাজা আলীমুল্লাহ্ ১৮৩৫ সালে এটি ব্যবহার করেন। নওয়াব আবদুল প্রাসাদটি নতুন করে নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়, যা পরবর্তীতে নওয়াব আহসান উল্লাহ্ পুনর্নির্মাণ করেন।

এই প্রাসাদের ছাদের ওপর একটি সুন্দর গম্বুজ আছে। মূল ভবনের বাইরে তিন তোরণবিশিষ্ট প্রবেশদ্বারও দেখতে সুন্দর। আহসান মঞ্জিলের অভ্যন্তরে দুটি অংশ

আছে। বৈঠকখানা ও পাঠাগার আছে পূর্বাংশে। পশ্চিম অংশে নাচঘর ও অন্যান্য আবাসিক কক্ষ। আর নিচতলায় রয়েছে দরবারগৃহ ও ভোজনকক্ষ।

বর্তমানে আহসান মঞ্জিল একটি অন্যতম জাদুঘর। পর্যটকদের কাছে এর ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যকলার এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এই প্রাসাদ।

ভিতরগড়, পঞ্চগড়

ভিতরগড় বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আবিষ্কৃত ২৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন দেয়ালবেষ্টিত নগরী, যা পঞ্চগড় জেলা শহর থেকে ১৬ কি.মি. দূরে সদর উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, রাজা প্রিথু এখানে তার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন যা ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত কার্যকর ছিল। কথিত উপাখ্যানে পাওয়া যায়, কুচবিহার থেকে 'কিচক' নামক নিম্নবর্ণের আদিবাসী পবিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা প্রিথুর রাজ্য আক্রমণ করেন। ফলে রাজা নিম্নবর্ণের আক্রমণকারীদের কাছ থেকে তার পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য মহারাজের দিঘিতে আত্মাহুতি দেন। কথিত মহারাজের দিঘি ছাড়াও ভিতরগড়ে আরও ৯টি দিঘি আছে। প্রফেসর ড. শাহনাজ হুসনে জাহান ভিতরগড় খনন করে এ পর্যন্ত যে সকল প্রমাণাদি পেয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, ভিতরগড় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দেয়ালঘেরা আয়তাকার নগরী, যা কোনো যুদ্ধদুর্গ নয়। সুপরিকল্পিত এই নগরটি ৪ ধাপে দেয়ালবেষ্টনী দিয়ে নির্মিত। দেয়ালগুলো ইট ও কাদা দিয়ে তৈরি। তবে এই নগরীতে বসবাসকারী মানুষেরা চাষাবাদের জন্য নিজস্ব পদ্ধতিতে সেচব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্রত্নপর্যটকরা এই নগরী দেখতে দেখতে হারিয়ে যাবেন ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে।

কাপ্তাই হ্রদ

চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা। এখানে পর্যটক আকৃষ্ট অনেক কিছু দেখার আছে। বিশেষত কাপ্তাই হ্রদ যা কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট। এই হ্রদের স্বচ্ছ ও শান্ত পানিতে নৌকাভ্রমণ অত্যন্ত সুখকর। হ্রদের ওপর আছে ঝুলন্ত সেতু। জেলার বরকল উপজেলার শুভলংয়ের পাহাড়ি ঝরনা ইতোমধ্যে পর্যটকদের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। ভরা বর্ষা মৌসুমে মূল ঝরনার জলধারা প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু থেকে নিচে আছড়ে পড়ে। এছাড়া কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ এলাকা।

কুয়াকাটা

কুয়াকাটা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সমুদ্র সৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। কুয়াকাটা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত। বরিশাল বিভাগের শেষ মাথায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের সর্বদক্ষিণে এ সমুদ্র সৈকত। দৈর্ঘ্য ১৮ কি.মি. এবং প্রস্থ ৩ কি.মি.। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নে কুয়াকাটা অবস্থিত। ঢাকা থেকে সড়কপথে এর দূরত্ব ৩৮০ কিলোমিটার, বরিশাল থেকে ১০৮ কিলোমিটার। পর্যটকদের কাছে কুয়াকাটা 'সাগরকন্যা' হিসেবে পরিচিত। কুয়াকাটা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়। সবচেয়ে ভালোভাবে সূর্যোদয় দেখা যায় সৈকতের গঙ্গামতির বাঁক থেকে আর সূর্যাস্ত দেখা যায় পশ্চিম সৈকত থেকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কুয়াকাটা। বর্তমানে সমুদ্রের করালগ্রাসে প্রশস্ততা কিছুটা কমেছে। কুয়াকাটা পরিচ্ছন্ন সৈকত আর কক্সবাজারের চেয়ে অনেক কম কোলাহলপূর্ণ। যারা নিরিবিলি সৈকত পছন্দ করেন তাদের জন্য বেড়ানোর আদর্শ জায়গা কুয়াকাটা। সৈকত ঘেঁষেই আছে সারি সারি নারিকেল বাগান। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউগুলো যখন এসে পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন স্নিগ্ধতা মন ছুঁয়ে যায়। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে ১০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে রয়েছে আকর্ষণীয় স্থান গঙ্গামতির চর। সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার জিরোপয়েন্ট থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার পূর্ব দিকে গড়ে তোলা হয়েছে পরিকল্পিত ইকো-পার্ক। ৭০০ একর জায়গাজুড়ে এ পার্কটি অবস্থিত। এ পার্কের বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও শোভাবর্ধনকারী ৪২ হাজার বৃক্ষ রয়েছে।

জাতীয় সংসদ ভবন

জাতীয় সংসদ ভবন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান ভবন। এটি ঢাকার শেরে বাংলা নগর এলাকায় অবস্থিত। প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই আই কান এটির মূল স্থপতি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আটটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনের পর গঠিত সংসদের অধিবেশনগুলো অনুষ্ঠিত হয় পুরোনো সংসদ ভবনে, যা বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) জন্য আইনসভার জন্য জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণ শুরু হয় ১৯৬১ সালে। ১৯৮২ সালের ২৮শে জানুয়ারি নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর একই বছরের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনে প্রথম সংসদ ভবন ব্যবহৃত হয়। তখন থেকেই আইন প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল কেন্দ্র হিসেবে এই ভবন ব্যবহার হয়ে আসছে। লুই আইকান

কমপ্লেক্সের অবশিষ্ট অংশের ডিজাইন করেন। কমপ্লেক্সের মধ্যে আরও আছে সুদৃশ্য বাগান, কৃত্রিম হ্রদ এবং সংসদ সদস্যদের আবাসস্থল।

জাফলং

জাফলং বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার অন্তর্গত একটি এলাকা। জাফলং সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এখানে পাহাড় আর নদীর অপূর্ব সম্মিলন বলে এই এলাকা বাংলাদেশের অন্যতম একটি পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্তবর্তী এলাকায় জাফলং অবস্থিত। এর অপর পাশে ভারতের ডাউকি অঞ্চল। ডাউকি অঞ্চলের পাহাড় থেকে ডাউকি নদী এই জাফলং দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মূলত পিয়াইন নদীর অববাহিকায় জাফলং অবস্থিত। সিলেট জেলার জাফলং-তামাবিল-লালখান অঞ্চলে রয়েছে পাহাড়ি উত্তলভঙ্গ। এই উত্তলভঙ্গে পাললিক শিলা প্রকটিত হয়ে আছে, তাই ওখানে বেশ কয়েকবার ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশে চার ধরনের কঠিন শিলা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভোলাগঞ্জ-জাফলংয়ে পাওয়া যায় কঠিন শিলার নুড়ি। এছাড়া বর্ষাকালে ভারতীয় সীমান্তবর্তী শিলং মালভূমির পাহাড়গুলোতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে ওইসব পাহাড় থেকে ডাউকি নদীর প্রবল স্রোত বয়ে আনে বড়ো বড়ো শিলা। এ কারণে সিলেট এলাকার জাফলংয়ের নদীতে প্রচুর পরিমাণে পাথর পাওয়া যায়। আর এই এলাকার মানুষের জীবিকা গড়ে উঠেছে এই পাথর উত্তোলন ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণকে ঘিরে।

মাধবকুণ্ড ইকো-পার্ক

মাধবকুণ্ড ইকো-পার্ক, বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের অন্তর্গত মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার কাঁঠালতলিতে অবস্থিত একটি ইকো-পার্ক। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রেস্ট হাউজ ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এই ইকো-পার্কের অন্যতম আকর্ষণ হলো মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, পরিকুণ্ড জলপ্রপাত, শ্রী শ্রী মাধবেশ্বরের তীর্থস্থান এবং চা বাগান। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত হিসেবে সমধিক পরিচিত। পাথারিয়া পাহাড় (পূর্বনাম আদম আইল পাহাড়) কঠিন পাথরে গঠিত এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে গঙ্গামারাছড়া বহমান। এছাড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধবছড়া। অর্থাৎ গঙ্গামারা ছড়া হয়ে বয়ে আসা জলধারা [১২ অক্টোবর ১৯৯৯-এর হিসেব মতে] প্রায় ১৬২ ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়ে মাধবছড়া হয়ে প্রবহমান। সাধারণত একটি মূল ধারায় পানি সব সময়ই পড়তে থাকে, বর্ষাকাল এলে মূল ধারার পাশেই আরেকটা ছোটো ধারা তৈরি হয় এবং ভরা বর্ষায় দুটো ধারাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় পানির তীব্র তোড়ে।

জলের এই বিপুল ধারা পড়তে পড়তে নিচে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট কুণ্ডের। এই মাধবছড়ার পানি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে হতে গিয়ে মিশেছে হাকালুকি হাওড়ে।

পানাম নগর

পানাম নগর নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর। বড়ো নগর, খাস নগর, পানাম নগর প্রাচীন সোনারগাঁয়ের এই তিন নগরের মধ্যে পানাম ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এখানে কয়েক শতাব্দী পুরোনো অনেক ভবন রয়েছে, যা বাংলার বারোভূঁইয়াদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁওয়ের ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই নগরী গড়ে ওঠে।

প্রাচীন বাংলা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত পর্যটন

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে যা বর্তমানে পর্যটন স্পট হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের স্মৃতিকে লালন করার জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার চেতনাকে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ ও ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধ স্মরণে নির্মিত এসব অসংখ্য ভাস্কর্য রাজধানী শহর ও দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের বাইরে, বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলেও রয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের এসব ভাস্কর্য। এই সব স্মৃতিসৌধ ও ভাস্কর্য বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ স্থান ও স্থাপনা।

উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত উয়ারী এবং বটেশ্বর গ্রাম দুটি

ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত। প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত মধুপুর গড়ের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এ গ্রাম দুটিতেই নিবিড় অনুসন্ধান ও সীমিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উয়ারী প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত হয়েছে ৬০০ মি. আয়তনের চারটি মাটির দুর্গ-প্রাচীর। দুর্গ প্রাচীরের ৫-৭ ফুট উঁচু ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু অংশ এখনো টিকে আছে। এছাড়াও দুর্গের চারিদিকে রয়েছে পরিখা (যদিও কালের ব্যবধানে তাতে মাটি ভরাট হয়েছে) ভরাট হলেও পূর্ব প্রান্তের পরিখার চিহ্ন এখনো দৃশ্যমান। দুর্গের পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৫.৮ কি.মি. দীর্ঘ, ২০ মি. প্রশস্ত ও ১০ মি. উঁচু অসম রাজার গড় নামে একটি মাটির বাঁধ রয়েছে। সম্ভবত এটি দ্বিতীয় দুর্গ-প্রাচীর হিসেবে উয়ারী দুর্গনগরের প্রতিরক্ষার কাজ করত। ভারতের নাগার্জুনকুণ্ড হলো এরকম দ্বিস্তরবিশিষ্ট দুর্গ-প্রাচীরের আরেকটি উদাহরণ।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত উয়ারী নগরের বাইরে আরও ৫০টি প্রত্নস্থান এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। বন্যামুক্ত উঁচু স্থানে বসতি স্থাপনকারী মানুষের মতো উন্নত পরিকল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় মহাস্থান ও উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ অঞ্চলের বসতি বিন্যাসেও দেখা যায়। উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি দুর্গনগর, নগর বা একটি নগরকেন্দ্র। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে, উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একাধারে একটি নগর ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। বহু প্রত্নতত্ত্বপ্রেমী পর্যটক উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে বেড়ান।

মহাস্থানগড়

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। প্রসিদ্ধ এই নগরী ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর নামেও পরিচিত ছিল। একসময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও আগে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে

এখানে সভ্য জনপদ গড়ে উঠেছিল প্রত্নতাত্ত্বিকভাবেই তার প্রমাণ মিলেছে। ২০১৬ সালে এটিকে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত ও উদ্‌ঘাটন করার ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অবদান রয়েছে। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন প্রথম মহাস্থানগড়ের অবস্থান চিহ্নিত করেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রথম এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীকে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীরূপে চিহ্নিত করেন। অনেক পর্যটক ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষত সি. জে. ও'ডোনেল, ই. ভি. ওয়েস্টম্যাকট ও হেনরি বেভারিজ এই শহরতলি এলাকাটি পরিদর্শন করেন এবং তাদের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সন্ধান মেলে ব্রাহ্মী লিপির। সেই লিপিতে পুণ্ড্রনগরের প্রাদেশিক শাসক সম্রাট অশোক দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে রাজভান্ডার থেকে খাদ্যশস্য ও অর্থ সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন। এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রসিদ্ধ এই নগরীর প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে।

প্রাচীরবেষ্টিত এই নগরীর ভেতর রয়েছে বিভিন্ন আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ স্থান মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন শাসকবর্গের প্রাদেশিক রাজধানী ও পরবর্তীকালে হিন্দু সামন্ত রাজাদের রাজধানী ছিল। তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অসংখ্য হিন্দু রাজা ও অন্যান্য ধর্মের রাজারা রাজত্ব করেন। মহাস্থানগড়ের অবস্থান বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কি.মি. উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে গেলে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নগরী। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে এটি পুণ্ড্র রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩৯ থেকে ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন। ভ্রমণের ধারাবিবরণীতে তিনি তখনকার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ করে বর্ণনা দেন। বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ হওয়ায় চীন ও তিব্বত থেকে ভিক্ষুরা তখন মহাস্থানগড়ে আসতেন লেখাপড়া করতে। এরপর তারা বেরিয়ে পড়তেন দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। সেখানে গিয়ে তারা বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার বিস্তার ঘটাতেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত পর্যটন

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপনা। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে নবীনগরে এই স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেন। ১৯৭৮-এর জুন মাসে প্রাপ্ত ৫৭টি নকশার মধ্যে সৈয়দ মাইনুল হোসেন প্রণীত নকশাটি গৃহীত হয়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মূল স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বিজয় দিবসের পূর্বে সমাপ্ত হয়।

এই স্মৃতিসৌধটি বাংলাদেশের জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের স্মরণে নিবেদিত এবং মুক্তিযুদ্ধে শহিদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। স্মৃতিসৌধ এবং এর প্রাঙ্গণের আয়তন ৩৪ হেক্টর (৮৪ একর)। এছাড়াও রয়েছে একে পরিবেষ্টনকারী আরও ১০ হেক্টর (২৪ একর) এলাকা নিয়ে বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ একটি সবুজ বলয়। এই স্মৃতিসৌধ সকল দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় ও সাফল্যের যুগলবন্দি রচনা করেছে। মিনারটি ৪৫ মিটার (১৫০ ফুট) উঁচু এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিন্দুতে অবস্থিত। মিনার ঘিরে আছে কৃত্রিম হ্রদ এবং বাগান। স্মৃতিসৌধ চত্বরে আছে মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গকারী অজ্ঞাতনামা শহিদের দশটি গণসমাধি। স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা ১৫০ ফুট। সৌধটি সাত জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল নিয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ছোটো থেকে ক্রমশ বড়ো ক্রমে সাজানো হয়েছে। এই সাত জোড়া দেয়াল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি ধারাবাহিক পর্যায়কে নির্দেশ করে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৬'র শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর

মুক্তিযুদ্ধ– এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসেবে বিবেচনা করে সৌধটি নির্মিত হয়েছে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিসৌধ। এই স্মৃতিসৌধটি ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় অবস্থিত। স্মৃতিসৌধটির নকশা করেছেন স্থপতি ফরিদ ইউ আহমেদ ও জামি আল শাফি। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সন্তানদের সংগঠন প্রজন্ম ৭১-এর সহায়তায় রায়েরবাজারে স্মৃতিসৌধটি তৈরির প্রাথমিক প্রস্তাবনা আনা হয়েছিল। সংগঠনটি ১৯৯১ সালে এর অস্থায়ী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার স্থানে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাতে অধ্যাপক, সাংবাদিক, ডাক্তার, শিল্পী, প্রকৌশলী, লেখকসহ পূর্ব পাকিস্তানের ২০০ জন বুদ্ধিজীবীদের ঢাকায় একত্র করা হয়েছিল। মিরপুর, মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, রাজারবাগ এবং শহরের বিভিন্ন স্থানের নির্যাতন সেলে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের রায়েরবাজার এবং মিরপুরে হত্যা করা হয়। নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে বাংলাদেশে শোক প্রকাশ করা হয়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের পূর্ব-দক্ষিণ পাশের অংশ স্মৃতিসৌধের যেখানে মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় সেখানে রায়েরবাজারের মূল ইটভাটা ১৭.৬৮ মি. পূর্ব, ০.৯১ মি. উঁচু এবং ১১৫.৮২ মি. দীর্ঘ বাঁকা ইটের প্রাচীর। প্রাচীর নিজেই দুঃখ ও দুঃখের গভীরতা প্রদর্শক, যার দুই প্রান্তই নষ্ট হয়ে গেছে। দেয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৬.১০ মি. গুনন ৬.১০ মি. বর্গাকার জানালা দিয়ে দর্শকরা আকাশ দেখতে

পারে। এছাড়াও প্রাচীরের স্কেল নিচের দিকে গেছে। বাঁকা প্রাচীরের সামনে পানির মধ্যে অবস্থিত একটি কালো গ্রানাইট স্তম্ভ যা বিষাদের প্রতিনিধিত্ব করে। সম্পূর্ণ স্থাপত্যটি তৈরি করা হয়েছে লাল ইট দিয়ে, যা নির্যাতনের পর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্তের চিহ্ন বহন করে।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর

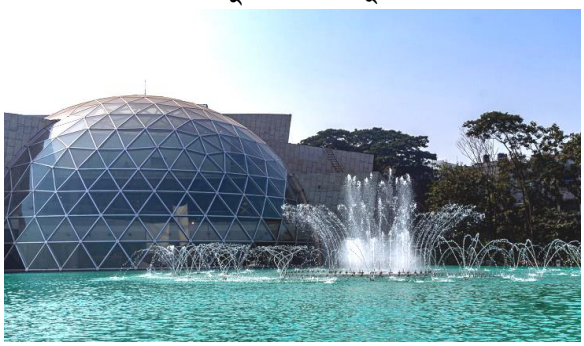

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৭ সালে ঢাকার মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশপথে সর্বপ্রথম সামরিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হলেও দর্শনার্থীদের কথা বিবেচনা করে ১৯৯৯ সালে বিজয়সরণিতে জাদুঘরটিকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হয়।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরটি বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারের পশ্চিম পাশে ১০ একর জমিতে নির্মিত হয়েছে, যেখানে স্বাধীনতার আগে ও পরে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘরটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর জন্য নির্ধারিত গ্যালারিসহ ছয়টি পৃথক অংশ রয়েছে এবং প্রতিটি বাহিনীর গ্যালারিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার। এখানে আর্ট গ্যালারিসহ মাল্টিপারপাস এক্সিবিশন গ্যালারি, ব্রিফিং রুম, স্যুভেনির শপ, ফার্স্ট এইড কর্নার, মুক্তমঞ্চ, থ্রিডি সিনেমা হল, মাল্টিপারপাস হল, সেমিনার হল, লাইব্রেরি, আর্কাইভ, ভাস্কর্য, মুর‍্যাল, ক্যাফেটেরিয়া, আলোকোজ্জ্বল ঝর্ণা ও বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর সবকিছু মিলে একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি জাদুঘর। এটি বাংলাদেশের একমাত্র মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এটি ঢাকার এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরের উদ্‌বোধন হয় ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ। মুক্তিযুদ্ধের অনেক দুর্লভ বস্তু আছে এই জাদুঘরে। ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ সেগুনবাগিচার একটি ভবন ভাড়া নিয়ে যথাযথ সংস্কার শেষে দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। আটজন ট্রাস্টির উদ্যোগে ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের এই প্রয়াস গোড়া থেকেই ব্যাপক মানুষের সমর্থন ও সহায়তায় ধন্য হয়েছে। বর্তমানে জাদুঘরের সংগ্রহভান্ডারে জমা হয়েছে পনেরো হাজারেরও বেশি স্মারক।

২০১১ সালের ৪ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্‌বোধন করেন। প্রায় দুই বিঘা জায়গার ওপর নির্মিত এই ভবনের ব্যবহারযোগ্য আয়তনের পরিমাণ ১ লাখ ৮৫ হাজার বর্গফুট। নতুন ভবনে ছয়টি গ্যালারি রয়েছে। জাদুঘর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান গ্যালারিতে নিদর্শন উপস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে। গ্যালারিগুলো ভবনের চতুর্থ ও পঞ্চম তলায়। প্রথম গ্যালারিতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কালপর্বে এই জনপদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রত্ননিদর্শন রয়েছে। দ্বিতীয় গ্যালারিতে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ঘটনা থেকে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় প্রবাসী সরকার গঠনপর্ব পর্যন্ত রয়েছে। এই গ্যালারিতে শব্দ ও

আলোর প্রক্ষেপণের একটি বিশেষ প্রদর্শনী আছে। এতে ২৫শে মার্চ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার বর্বরতা তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ গ্যালারিতে বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালির প্রতিরোধ গড়ে তোলার নিদর্শন রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, গণমানুষের দুরবস্থা, যৌথ বাহিনীর অভিযান, বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়, বুদ্ধিজীবী হত্যা, ঢাকায় পাকিস্তানি দখলদারদের আত্মসমর্পণ– এই ক্রমানুসারে সাজানো হয় শেষ গ্যালারিটি।

বাছাই করা নিদর্শন গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের পুরো ঘটনা। বাকিগুলো সংরক্ষিত রয়েছে জাদুঘরের আর্কাইভে। ভূগর্ভে রয়েছে তিনটি তলা। ওপরের ছয়টি তলায় অফিস মিলনায়তন, পাঠাগার, গবেষণাকেন্দ্র, ক্যান্টিন, প্রদর্শনী কক্ষ রয়েছে। শিখা অনির্বাণ রয়েছে প্রথম তলায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথভাবে উপস্থাপন। এর বিশেষ লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ে সচেতন করে তোলা, যার ফলে তারা মাতৃভূমির জন্য গর্ব ও দেশাত্ববোধে উদ্দীপ্ত হবে এবং উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হবে।

বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালি পুলিশ সদস্যদের অপরিসীম আত্মত্যাগ ও গৌরবের ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ ও নয় মাসের রক্তাক্ত সংগ্রামে পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগের

গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে জনাব হাবিবুর রহমান বিপিএম (বার) পিপিএম (বার), অতিরিক্ত আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৩ সালের ২৪শে মার্চ বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাত্রা শুরু করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ আলোকচিত্র এবং শৈশব ও রাজনৈতিক জীবনের অসাধারণ মুহূর্ত জাদুঘরের বঙ্গবন্ধু গ্যালারিতে তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকাশনা দিয়ে সাজানো হয়েছে এর লাইব্রেরি। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ দলিল সংরক্ষিত হয়েছে জাদুঘরের আর্কাইভ শাখায়। সর্বোপরি ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের উদ্ভব এবং স্বাধিকার আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা এবং আত্মদানের স্মৃতিস্মারক প্রদর্শিত হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ইতিহাসের যে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল সেই পৈশাচিকতার প্রথম টার্গেট ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে। স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে ২৫শে মার্চ কালরাত্রে প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলে। আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় না হয়ে দ্রুততম সময়ে সুসংগঠিত হয়ে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুল সদস্যদের বিরুদ্ধে নিজেদের থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে যে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা পুলিশের সদস্যরা করেছিলেন, সমর ইতিহাসে তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চে রাজারবাগে পুলিশের ভূমিকা ও তার ধারাবাহিকতা এবং মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে বাংলাদেশ পুলিশকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করে।

এ জাদুঘরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বেতারযন্ত্র, পাগলা ঘণ্টা, মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত থ্রি নট থ্রি রাইফেল, ২৫শে মার্চ রাতে ব্যবহৃত মর্টারশেলের অংশবিশেষ, শহিদ পুলিশ সদস্যদের ব্যবহৃত পোশাক, চশমা, টুপি, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার টেলিগ্রাম লেটার, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইজিপি আবদুল খালেকের ব্যবহৃত চেয়ার, যুদ্ধের সময় উদ্ধার করা গুলি ও মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হ্যান্ড মাইক,

যুদ্ধের সময় দূর থেকে শত্রুর অবস্থান দেখার জন্য পুলিশ বাহিনীর সার্চলাইট, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের টেলিকম ভবনের দেয়াল ঘড়ি, যুদ্ধকালীন পুলিশ সদস্যদের বিভিন্ন চিঠিপত্র, ২৫শে মার্চ রাতে সারাদেশে পুলিশ সদস্যদের রাজারবাগ আক্রমণের খবর দেওয়া হেলিকপ্টার ব্যাজ, ওয়্যারলেস সেট, পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত বেঞ্চসহ শত শত ঐতিহাসিক নিদর্শন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অবস্থিত একটি স্মৃতিসৌধ। মেহেরপুর জেলা সদর থেকে সড়কপথে এই আম্রকাননের দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি তুলে ধরার জন্য এই কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি স্মৃতিসৌধ এবং যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সেক্টরগুলোর অবস্থান সংবলিত একটি মানচিত্র। এই কমপ্লেক্স মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির স্মারক নমুনা স্থাপন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স, ঐতিহাসিক আম্রকানন, ঐতিহাসিক ৬ দফার রূপক উপস্থাপনকারী ছয় ধাপের গোলাপ বাগান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক জীবন্ত প্রদর্শন স্থানে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভেতরের অংশে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার নান্দনিক ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৭ই এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ

গ্রহণ করে। এই স্থানকে পরবর্তী সময়ে 'মুজিবনগর' নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের কালানুক্রমিক ধারায় এই অস্থায়ী সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের দিনকে 'মুজিবনগর দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন সময়ে এই অস্থায়ী সরকার যেখানে গঠিত হয় সেখানে এই স্মৃতিসৌধটি গড়ে তোলা হয়েছে। এর স্থপতি তানভীর করিম।

জাগ্রত চৌরঙ্গী

জাগ্রত চৌরঙ্গী মুক্তিযুদ্ধের মহান শহিদের অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য। আবদুর রাজ্জাক জাগ্রত চৌরঙ্গীর রূপকার। এটি ১৯৭৩ সালে নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত এটিই প্রথম ভাস্কর্য। ১৯৭১ সালের ১৯শে মার্চের আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ। আর এই প্রতিরোধযুদ্ধে শহিদ হুরমত উল্যা ও অন্য শহিদের অবদান এবং আত্মত্যাগকে জাতির চেতনায় সমুন্নত রাখতে জয়দেবপুর চৌরাস্তার সড়কদ্বীপে স্থাপন করা হয় দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যকর্ম জাগ্রত চৌরঙ্গী।

অপরাজেয় বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা তিন নারী-পুরুষের ভাস্কর্য যেটি সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সেটি 'অপরাজেয় বাংলা'। এর তিনটি মূর্তির একটির ডান হাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে রাইফেলের বেল্ট ধরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এর মডেল ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম বেনু। থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অপর মূর্তির মডেল ছিলেন সৈয়দ হামিদ মকসুদ ফজলে। আর নারী মূর্তির মডেল ছিলেন হাসিনা আহমেদ। ১৯৭৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি পূর্ণোদ্যমে অপরাজেয় বাংলার নির্মাণকাজ শুরু হয়। ১৯৭৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টায় এ ভাস্কর্যের উদ্‌বোধন করা হয়। তবে অপরাজেয় বাংলার কাছে ভাস্করের নাম খচিত কোনো শিলালিপি নেই। স্বাধীনতার এ প্রতীক তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন গুণী শিল্পী ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনের বেদিতে দাঁড়ানো তিন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিচ্ছবি যেন অন্যায় ও বৈষম্য দূর করে দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠার গান গাইছে। এ ভাস্কর্যে সব শ্রেণির যোদ্ধার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পশ্চিম পাশে ডাস ক্যাফেটেরিয়ার পেছনে অবস্থিত এ ভাস্কর্য অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা জোগায়। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে এ ভাস্কর্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এটি একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচারের একটি খণ্ডচিত্র। ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের ২৫শে মার্চ এটির কাজ শেষে উদ্‌বোধন করা হয়। এটি গড়েছেন অন্যতম কীর্তিমান ভাস্কর শামীম সিকদার। এটির চৌকো বেদির ওপর মূল ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে।

সংশপ্তক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯০ সালের ২৬শে মার্চ নির্মিত হয়েছিল স্মারক ভাস্কর্য সংশপ্তক। এ ভাস্কর্যটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে এক হাত, এক পা হারিয়েও রাইফেল হাতে লড়ে যাচ্ছেন দেশমাতৃকার বীর সন্তান। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়ে যান যে অকুতোভয় বীর সেই সংশপ্তক। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এক পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্কর্যটি। এর রূপকার হামিদুজ্জামান খান।

সাবাস বাংলাদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে নতুন কুড়ির তৈরি 'সাবাস বাংলাদেশ' নামের ভাস্কর্য দেখা যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক শিক্ষক-ছাত্র শহিদ হওয়ায় এর স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার জন্য উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। নির্মাণের জায়গা নির্ধারণ করা হয় সিনেট ভবনের দক্ষিণে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৯১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর উপস্থাপনায় নির্মাণকাজ শুরু হয়। নির্মাণকাজ শেষে ফলক উন্মোচন করেন শহিদ জননী জাহানারা ইমাম। ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে ৪০ বর্গফুট জায়গা নিয়ে, যেখানে রয়েছে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি। একজন রাইফেল উঁচু করে দাঁড়িয়ে আর তার বাঁ বাহুটি

মুষ্টিবদ্ধ করে জাগানো। অন্যজন রাইফেল হাতে দৌড়ের ভঙ্গিতে রয়েছে, যার পরনে প্যান্ট, মাথায় এলোমেলো চুলের প্রাচুর্য যা কি না আধুনিক সভ্যতার প্রতীক। এ দুজন মুক্তিযোদ্ধার পেছনে ৩৬ ফুট উঁচু একটি দেয়ালও দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের ওপরের দিকে রয়েছে একটি শূন্য বৃত্ত, যা দেখতে সূর্যের মতোই। ভাস্কর্যটির নিচের দিকে ডান ও বাম উভয় পাশে ৬ ফুট বাই ৫ ফুট উঁচু দুটি ভিন্ন চিত্র খোদাই করা হয়েছে। ডানদিকের দেয়ালে রয়েছে দুজন যুবক-যুবতী। যুবকের কাঁধে রাইফেল, মুখে কালো দাড়ি, কোমরে গামছা বাঁধা। আর যুবতীর হাতে একতারা। গাছের নিচে মহিলা বাউলের ডান হাত বাউলের বুকে বাম দিকের দেয়ালে রয়েছে মায়ের কোলে শিশু, দুজন যুবতী একজনের হাতে পতাকা। পতাকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেঞ্জি পরা এক কিশোর। শিল্পী নিতুন কুণ্ডু তার মনতুলি দিয়ে এমনভাবে ভাস্কর্যটি চিত্রিত করেছেন দেখলে মনে হয় যেন ১৯৭১ সালেরই অর্জিত স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি।

বিজয় '৭১

১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্তপ্রতীক হয়ে আছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য বিজয় '৭১। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বিজয় '৭১। ভাস্কর্যে একজন নারী, একজন কৃষক ও একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার নজরকাড়া ভঙ্গিমা বারবার মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায় দর্শনার্থীদের। একজন কৃষক মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের পতাকা তুলে

ধরেছে আকাশের দিকে। তার ডান পাশেই শাশ্বত বাংলার সর্বস্বত্যাগী ও সংগ্রামী নারী দৃঢ়চিত্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। যার সঙ্গে আছে রাইফেল। অন্যদিকে একজন ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে গ্রেনেড ছোড়ার ভঙ্গিমায় বাম হাতে রাইফেল নিয়ে তেজোদীপ্তচিত্তে দাঁড়িয়ে। বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী শ্যামল চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বিজয় '৭১ ভাস্কর্যটির নির্মাণকাজ ২০০০ সালের জুন মাসে শেষ হয়। এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৪ লাখ টাকা। বিজয় '৭১ ভাস্কর্য দেখতে প্রতিদিন অগণিত মানুষ ক্যাম্পাসে ভিড় জমায়।

মুক্তবাংলা

মুক্তবাংলা ভাস্কর্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্মরণার্থে বাংলাদেশের একটি অন্যতম ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্যটি ১৯৯৬ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের পাশেই নির্মাণ করা হয়। চিত্রকর রশিদ আহমেদ এই ভাস্কর্যটির নকশা করেছিলেন। ভাস্কর্যটি ইসলামী স্থাপত্য ও আধুনিক ধারণার সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য মুহাম্মাদ ইনাম-উল হক এই ভাস্কর্যটি ১৯৯৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর উদ্‌বোধন করেন। মুক্তবাংলা ভাস্কর্যটি কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের উত্তর পাশে অদূরেই অবস্থিত। ভাস্কর্যটির পশ্চিম পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ও দক্ষিণ পাশে শেখ মুজিবুর রহমানের সুদীর্ঘ ভাস্কর্য 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব' অবস্থিত।

একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

একাত্তরের স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর সংঘটিত হয়েছিল নির্যাতন, গণহত্যা এবং পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিপরীতে বাংলার দামাল ছেলেরাসহ সর্বস্তরের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই বিষয় দুটি চিত্রায়িত হয়েছে 'একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি' ভাস্কর্যে। এটির শিল্পী ভাস্কর রাসা। এটির অবস্থান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৮ সালের ৩১শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি নির্মিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আর্দশভিত্তিক পর্যটন

বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বের পরিচিত একজন নন্দিত বিশ্বনেতা। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ নিয়ে দেশে-বিদেশের অসংখ্য মানুষের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। অনেক পর্যটক বিখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়রের জন্মস্থান পরিদর্শনের জন্য জন্য ইংল্যান্ডের স্ট্রেটফোর্ড ভ্রমণ করেন। অনেকে নেলসন ম্যান্ডেলার বাসভবন এবং রাজনৈতিক স্মৃতি দেখার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। একইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে রয়েছে অসংখ্য পর্যটন আকর্ষণ, যা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান, শৈশব, ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক কর্মজীবন, কারাগারের জীবন এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলাদেশের জন্য পর্যটন আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এসব বিষয় ব্যাপকভাবে চিত্রিত ও প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব।

মুজিবস্ বাংলাদেশ

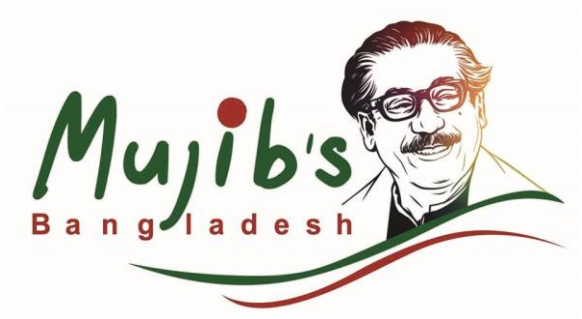

২০২০ সাল ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর বছর। এ উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ এবং তাঁর দর্শন বিশ্বদরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মুজিববর্ষের কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। একই সাথে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের পরিচিতি এবং পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনে বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমেটিক ব্যক্তিত্ব ও ইমেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বঙ্গবন্ধুর বীরত্বপূর্ণ বক্তৃতা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এখনো আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ই মার্চ ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ লুৎফর রহমান এবং সায়েরা খাতুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর তিনি কালকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইসলামিয়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন।

অল্প বয়স থেকেই তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। ১৯৪০ সালে তিনি 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন' এবং 'অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগে'র কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। একই সময় তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগের মহকুমা শাখার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৪৭-এর শুরুতেই শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। মুসলিম লীগ থেকে নিজেকে সরিয়ে তিনি নতুন সংগঠনের মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রকাশে উদ্যোগী হন। তিনি 'গণতান্ত্রিক যুব লীগে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নির্বাচিত হন। একই সময়ে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ' গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি নবগঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি এই দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৫৩ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এই দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ভাষা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদ এবং ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়, যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে।

১৯৫৪ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই মন্ত্রিসভায় তিনি সমবায় ঋণ এবং গ্রামীণ পুর্নগঠন বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য, শ্রম এবং শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তবে ১৯৫৭ সালে পূর্ণ সময় আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পালনের স্বার্থে তিনি মন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৬৩ সালে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৬ সালে ১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের কট্টর সমালোচক। ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই ৬ দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা।

মুজিবের ৬ দফার প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ভীত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বাংলার জনগণ। জনরোষের কাছে নতি স্বীকার করে এক পর্যায়ে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় শোষকগোষ্ঠী। ১৯৬৯ সালের ২৩ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানেই উত্থাপিত হয় ১১ দফা দাবি যার মধ্যে ৬ দফার সবগুলো দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। লাখো মানুষের এই জমায়েতে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, "একসময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি, 'আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।"

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের নীতির পুরোপুরি বিপক্ষে ছিল। আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংসদের অধিবেশন ডাকা নিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। শেখ মুজিবুর রহমান তখনই বুঝে যান যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐতিহাসিক এ ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর ডাকে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা বাংলা। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতির এই জাগরণে ভীত ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, নিষিদ্ধ করেন আওয়ামী লীগকে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।

এরপর আসে ২৫শে মার্চ ১৯৭১। রাতের অন্ধকারে নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা, শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে কোলের শিশু কেউ রক্ষা পায়নি পাকহায়েনাদের নারকীয়তা থেকে। শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অবশ্য তার আগেই পাকবাহিনীর অভিযান শুরু হলে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক আন্দোলনে শামিল হতে আহ্বান জানান।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এ সরকারের অধীনেই গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী এবং শুরু হয় পাকসেনাদের প্রতিহত করার সংগ্রাম। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে আসে বিজয়। ১৬ই ডিসেম্বর সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান যেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেখানেই বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের নতুন একটি দেশ।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতাকে বরণ করতে লাখো মানুষের ঢল নামে বিমানবন্দরে। দেশে ফিরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন

জানান বঙ্গবন্ধু এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাহায্য আসতে শুরু করে। শুরু হয় বাংলাদেশ পুনর্গঠনের এক নতুন যুদ্ধ। এর ফলে দেশে স্থিতিশীলতা আসতে শুরু করে। সমগ্র দেশ যখন ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই আসে আরেকটি আঘাত।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে একদল স্বাধীনতাবিরোধী, বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা হত্যা করে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই সময় দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান। সদ্য স্বাধীন জাতির জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি নিয়ে আসে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড, তৈরি করে রাজনৈতিক শূন্যতা, ব্যাহত হয় গণতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারা।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত ট্যুরিজম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ও বিদেশে একজন নন্দিত বিশ্বনেতা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের অসংখ্য মানুষ, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও স্থাপনাসমূহ দেখতে আসেন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণস্থল বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রভৃতি দর্শনীয় ও পর্যটন স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। নিচে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত ট্যুরিজম স্থানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

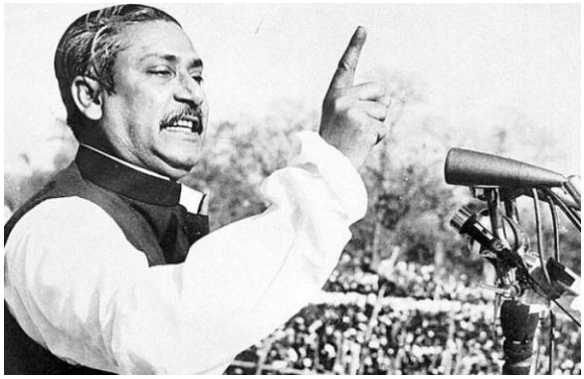

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঢাকার রমনায় অবস্থিত তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে ১৮ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ইউনেস্কো কর্তৃক ইতোমধ্যে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ৭ই মার্চের ভাষণ ও ডকুমেন্টারি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে মনোনীত হয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থাটি ঐতিহাসিক এই ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারের মেমোরিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

স্বাধীনতা স্তম্ভ

তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উত্তর পাশে 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' নামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মারক নির্মিত হয়েছে। শিখা চিরন্তন বরাবর দক্ষিণ দিকে এটির অবস্থান। ভূমি থেকে কিছুটা ওপরে নির্মিত একটি প্রশস্ত চৌকো কংক্রিটের চাতালের দক্ষিণ পাশে এটির অবস্থান। এই চাতালের পশ্চিম পাশে রয়েছে একটি কৃত্রিম জলাধার এবং পূর্ব পাশে রয়েছে টেরাকোটায় আচ্ছাদিত একটি অনতিউচ্চ দেয়াল যার পেছনেই ভূ-গর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘরে যাওয়ার সিঁড়ি। সন্ধেবেলায় কাচ নির্মিত স্তম্ভটি একটি আলোকস্তম্ভে পরিণত হয়। এ থেকে বিচ্ছুরিত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোকরশ্মি চারপাশকে আলোময় করে তোলে।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর বা সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বিশেষ জাদুঘর যা বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি সংরক্ষণার্থে স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে শেখ মুজিব স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই বসবাস করতেন। তিনি যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তখন এই ভবনেই ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে সামরিক বাহিনীর একদল সশস্ত্র সদস্যের আক্রমণে সপরিবারে শাহাদতবরণ করেন। ১৯৮১ সালে বাড়িটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরে বঙ্গবন্ধুর দুই জীবিত উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ১৯৯৪ সালের ১১ই এপ্রিল জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন করে এই বাড়িটি ট্রাস্টের হাতে অর্পণ করেন। ১৯৯৪ সালে ১৪ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত কিছু সামগ্রীর সংগ্রহ নিয়ে এ বাড়িতেই 'জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' নামে একটি জাদুঘর স্থাপন করা হয়। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর এই বাড়িটি ও টুঙ্গিপাড়ার বাড়িটি দেখাশোনার পাশাপাশি বর্তমানে এর অধীনে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ছাড়াও শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজটি পরিচালিত হচ্ছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ

বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি। এটি বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত এবং এটির স্থপতি এহসান খান, ইশতিয়াক জহির ও ইকবাল হাবিব নকশা করেছেন।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তাঁকে টুঙ্গিপাড়ায় সমাহিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের জুনে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হওয়ার পর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ শুরু করে যা ২০০০ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সমাধিসৌধের কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে পাঠাগার, গবেষণাকেন্দ্র, প্রদর্শনী কেন্দ্র, মসজিদ, পাবলিক প্লাজা, প্রশাসনিক ভবন, ক্যাফেটেরিয়া, উন্মুক্ত মঞ্চ, বকুলতলা চত্বর ও স্যুভেনির কর্নার। মাজার কমপ্লেক্সের পাঠাগারে দেড় হাজারেরও বেশি বই রয়েছে।

টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

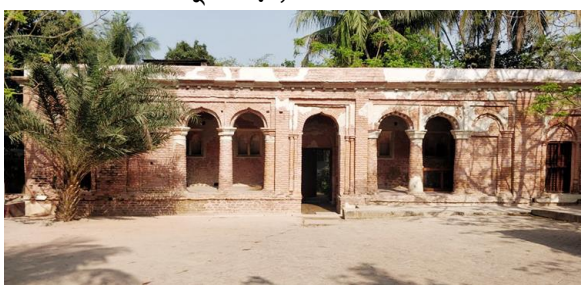

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর বাল্যস্মৃতিবিজড়িত প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাল, পুকুর, খেলার মাঠ এসবের যথাযথ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯২৭ সালে জিটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন বঙ্গবন্ধু। ১৯৩০ সালে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত তিনি এ বিদ্যালয়েই লেখাপড়া করেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে স্কুলটিতে জাতির পিতার নানা দুর্লভ ছবি নিয়ে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি করা হয়েছে।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার বাড়ির পাশেই বয়ে যাওয়া ছোটো খাল এবং ঘাটের হিজল গাছ বঙ্গবন্ধুর অনেক স্মৃতি বহন করে চলছে। এ হিজল গাছের নিচে খালের ঘাটে বঙ্গবন্ধু গোসল করতেন। এই হিজল গাছ বা হিজল তলা, বঙ্গবন্ধু বাল্যকালের খেলার মাঠ, তিনি যে পুকুরে গোসল করতেন সেই পুকুর, বাল্যকালে লেখাপড়া করা স্কুল, তাঁর আদি পুরুষ যেখানে বসবাস করতেন সেই ভিটা, এমন সব জায়গা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর এসব স্মৃতিবিজড়িত স্থানে ইতোমধ্যে বেশকিছু কাজ করা হয়েছে। এসব স্থান দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দর্শনার্থীরা এসে জাতির পিতার বাল্যকাল কোথায়, কীভাবে কেটেছে, সে সম্পর্কে জানতে পারেন।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ধরে রাখতে তাঁর বাড়ির পাশের খালের পাড় ও হিজল গাছের চারপাশ বাঁধাই করা হয়েছে। প্রতিদিনই জাতির পিতার স্মৃতিবিজড়িত হিজল তলাসহ খালটি পরিদর্শনে আসেন শত শত দর্শনার্থী ও পর্যটক। সারাদিন নানা বয়সের দর্শনার্থী ও পর্যটক দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে অনুভব করেন বঙ্গবন্ধুর স্পর্শ।

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

–অন্নদাশঙ্কর রায়

ইউনেস্কো ঘোষিত বাংলাদেশের ঐতিহ্য

UNESCO ঘোষিত বাংলাদেশের তিনটি টেনজিবল হেরিটেজ রয়েছে। ১৯৮৫ সালে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত প্রথম দুটি স্থান ছিল মসজিদের শহর বাগেরহাট এবং পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৯৭ সালে প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে সুন্দরবন তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

হেরিটেজ	স্থান	সাল
ষাটগম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫
সোমপুর বিহার	পাহাড়পুর, নওগাঁ	১৯৮৫
সুন্দরবন	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনা	১৯৯৭

টেনজিবল হেরিটেজসমূহ নিম্নরূপ–

ষাটগম্বুজ মসজিদ

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বাগেরহাটে ঠাকুর দিঘি নামে একটি স্বাদু পানির জলাশয়ের পূর্ব তীরে অবস্থিত ষাটগম্বুজ মসজিদ। বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ এবং একে বর্ণনা করা হয়েছে 'ঐতিহাসিক মসজিদ যা মুসলিম বাংলার স্বর্ণযুগের প্রতিনিধিত্ব করে'। মসজিদটি এই কারণে অসাধারণ যে এর ৬০টি পিলার আছে যা ৭৭টি অসাধারণভাবে বাঁকানো 'নিচু বর্গাকার গম্বুজ' ধারণ করে যা সময়ের সাথে ক্ষয় হচ্ছে, এর বেশ কয়েকটি চারকোণা গম্বুজ আছে যেগুলো বাংলা স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। খান জাহান আলি ১৪৪০ সালে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা

করেন। এটি প্রার্থনা, সম্মেলনকেন্দ্র এবং মাদ্রাসা (ইসলামিক বিদ্যালয়) হিসেবে ব্যবহার হতো। ৭৭টি গম্বুজ ছাদের ওপর অবস্থিত এবং চারটি ছোটো গম্বুজ মসজিদের চারকোণার মিনারে তথা টাওয়ারে অবস্থিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ১১টি বিরাট আকারের খিলান যুক্ত দরজা আছে। মাঝের দরজাটি অন্যগুলোর চেয়ে বড়ো। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ৭টি করে দরজা। মসজিদের চারকোণায় ৪টি মিনার আছে। এগুলোর নকশা গোলাকার এবং এরা ওপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। এদের কার্নিশের কাছে বলয়াকার ব্যান্ড ও চূড়ায় গোলাকার ব্যান্ড আছে। মিনারগুলোর উচ্চতা, ছাদের কার্নিশের চেয়ে বেশি। সামনের দুটি মিনারে প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে এবং এখান থেকে আজান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পশ্চিম দেয়ালে ১১টি মিহরাব আছে যাতে পাথর ও টেরাকোটার কারুকার্য এবং মেঝেটি ইটের তৈরি। দেয়াল এবং মিহরাবগুলো সালফেট দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষতি সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদটির অধিকাংশই টেরাকোটা এবং ইট দ্বারা সজ্জিত এবং বিশাল সংখ্যক পর্যটক আকৃষ্ট করে।

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব (৭৮১-৮২১) অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন। ইউনেস্কোর মতে পাহাড়পুর বিহার বা সোমপুর বৌদ্ধবিহার দক্ষিণ হিমালয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্ম শিক্ষাদান কেন্দ্র ছিল। শুধু

উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয়, বরং চীন, তিব্বত, মায়ানমার (তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের স্বীকৃতি প্রদান করে।

সুন্দরবন

সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার ব-দ্বীপ এলাকায় অবস্থিত। এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার কিছু অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,৫১৭ বর্গকিলোমিটার (৬৬%) রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ (৩৪%) রয়েছে ভারতের মধ্যে।

সুন্দরবন ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর বাংলাদেশ ও ভারতীয় অংশ বস্তুত একই নিরবচ্ছিন্ন ভূমি সন্নিহিত অংশ হলেও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সূচিবদ্ধ হয়েছে, যথাক্রমে 'সুন্দরবন' ও 'সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান' নামে। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদা, চর এবং ম্যানগ্রোভ

বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা। মোট বনভূমির ৩১.১ শতাংশ, অর্থাৎ ১,৮৭৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল মিলিয়ে জলাকীর্ণ অঞ্চল। বনটি বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরনের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির ও সাপসহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। জরিপ মোতাবেক ১০৬টি বাঘ ও ১০০০০০টি থেকে ১৫০০০০টি চিত্রা হরিণ রয়েছে সুন্দরবন এলাকায়। ১৯৯২ সালের ২১শে মে সুন্দরবন রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুন্দরবনে প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক ঘুরতে আসে। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের অসংখ্য পর্যটক সুন্দরবনের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে সুন্দরবন ভ্রমণ করার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে।

সর্বাধিক প্রচুর গাছের প্রজাতি হলো সুন্দরী (Heritiera fomes) এবং গেওয়া (Excoecaria agallocha)। বনে ২৯০টি পাখি, ১২০টি মাছ, ৪২টি স্তন্যপায়ী, ৩৫টি সরীসৃপ এবং আটটি উভচর প্রজাতিসহ ৪৫৩টি প্রাণী বন্যপ্রাণীর বাসস্থান সরবরাহ করে।

এছাড়া আমরা ইনটেনজিবল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ৪টি উপাদান তালিকাভুক্ত করেছি। হেরিটেজগুলো হলো:

বাউল গান (২০০৮)

বাউল গান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংগীতের একটি অনন্য ধারা। এটি বাউল সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাধনগীত। আবহমান বাংলার প্রকৃতি, মাটি আর মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা এক হয়ে ফুটে ওঠে বাউল গানে। আরও ফুটে ওঠে সাম্য ও মানবতার বাণী।

জামদানি বুননের ঐতিহ্যবাহী শিল্প (২০১৩)

জামদানি হলো কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। জামদানি বুননকালে তৃতীয় একটি সুতা দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। মসলিন বয়নে যেমন ন্যূনপক্ষে ৩০০ কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়। জামদানি বয়নে সাধারণত ২৬-৮০-৮৪ কাউন্টের সুতা ব্যবহৃত হয়। হালে জামদানি নানা স্থানে তৈরি করা হয় বটে কিন্তু ঢাকাকেই জামদানির আদি জন্মস্থান বলে গণ্য করা হয়। জামদানি বয়নের অতুলনীয় পদ্ধতি ইউনেস্কো কর্তৃক একটি অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ) হিসেবে স্বীকৃত দেয়।

পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬)

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রা, মঙ্গল শোভাযাত্রা হলো পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ছাত্র এবং শিক্ষকদের একটি উৎসব। নববর্ষের দিন মঙ্গল শোভাযাত্রা উৎসব বাংলাদেশের ঐতিহ্যের গর্বের প্রতীক। সেই সাথে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের শক্তি ও সাহস এবং তাদের সত্য ন্যায়ের প্রমাণ।

সিলেটের শীতলপাটি বুননের ঐতিহ্যবাহী শিল্প (২০১৭)

সিলেটের শীতলপাটি বুননের ঐতিহ্যবাহী শিল্প মুডটা নামে পরিচিত একটি সবুজ বেতের ফিতে বুননের মাধ্যমে হস্তশিল্পের মাদুর তৈরির শিল্প মাদুরটি সারা বাংলাদেশের লোকেরা বিছানায় স্প্রেড বা প্রার্থনার মাদুর হিসেবে ব্যবহার করে। কারুশিল্প জীবিকার একটি প্রধান উৎস এবং পরিচয় একটি শক্তিশালী চিহ্ন। একটি পরিবার ভিত্তিক নৈপূণ্য। এটি পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন বা জিআই পণ্য

কোনো একটা দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া ও মানুষের সৃজনশীলতা মিলে কোনো পণ্য তৈরি হলে তাকে বলা হয় সেই দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন বা জিআই পণ্য)। শুধু বাংলাদেশেই উৎপাদিত হয়, এমন ১১টি পণ্য আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব কর্তৃপক্ষ থেকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্য কোনো দেশে নয়, এই পণ্যগুলো শুধু বাংলাদেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পায় জামদানি শাড়ি। এরপর একে একে স্বীকৃতি পেয়েছে ইলিশ মাছ, ক্ষীরশাপাতি আম, মসলিন, বাগদা চিংড়ি, ফজলি আম, কালিজিরা চাল, বিজয়পুরের সাদা মাটি, রাজশাহী সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি এবং দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব বিষয়ক সংস্থা ওয়ার্ল্ড প্রপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশনের নিয়ম মেনে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয় পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এই স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে। এসব পণ্যের প্রতি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ রয়েছে।

জামদানি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) পক্ষ থেকে ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো জামদানিকে জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের অনুমোদন চাওয়া হয়, যা ২০১৬ সালে স্বীকৃতি পায়। জামদানি শাড়ি হলো কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত

করা এক ধরনের বস্ত্র। একে মসলিনের উত্তরাধিকারীও বলা যায়। এই শাড়ি ও কাপড় কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য। নারায়ণগঞ্জের পাশে শীতলক্ষ্যা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া ও পরিবেশ জামদানি বোনার জন্য উপযোগী। শীতলক্ষ্যার পানির সঙ্গে রং মিশিয়ে রঙিন করা হয় সুতা। অন্য কোনো এলাকার পানি দিয়ে সুতার ওই স্থায়িত্ব ও রং আনা সম্ভব না। জামদানির আরেকটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এটি সম্পূর্ণ হাতে বোনা হয়ে থাকে। ওই কাপড় বোনার জন্য বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কারিগরের দরকার হয়, যাঁরা মূলত শীতলক্ষ্যার তীরে বসবাস করে থাকেন। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁওয়ে জামদানি তৈরি হয় সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে ঢাকার মিরপুরে বেনারসি পল্লির পাশে জামদানিপল্লি আছে। এছাড়া, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে ১৯৯৩ সালে বিসিকের তত্ত্বাবধানে ২০ একর জমির ওপর জামদানি নগর গড়ে তোলা হয়েছে।

ইলিশ

২০১৭ সালে ইলিশ মাছের জিআই স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করে বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর। আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওই বছরের জুনে গেজেট প্রকাশ করা হয়। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কোনো আপত্তি না করায় এ পণ্যের জিআই স্বত্ব পায় বাংলাদেশ। মৎস্যসম্পদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফিশের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। ইলিশ আছে বিশ্বের এমন ১১টি দেশের ১০টিতেই মাছটির উৎপাদন কমেছে। একমাত্র বাংলাদেশেই বাড়ছে। গত এক যুগে বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। দেশে গত ছয় বছরে ইলিশের ওজন গড়ে ৬০০ থেকে বেড়ে ৯০০ গ্রাম হয়েছে। ঠিকমতো পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ নিলে বছরে সাড়ে সাত লাখ টন ইলিশ উৎপাদন করা সম্ভব বলে মনে করেছেন বিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের ১০ শতাংশই ইলিশ। বাংলাদেশের জিডিপির ১ শতাংশ আসে ইলিশ থেকে। পদ্মা ও মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদ-নদী, শাখা-উপশাখা, মোহনা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে ইলিশ বিচরণ করে। এর মধ্যে পদ্মা ও মেঘনার ইলিশ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

বাগদা চিংড়ি

বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আবেদনের পর ২০২১ সালে জিআই স্বীকৃতি পায় বাগদা চিংড়ি। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং

উপকূলীয় সমুদ্র এলাকা বাগদা চিংড়ির আদি ভূমি। বাঘের মতো শরীরে ডোরাকাটা থাকে বলে একে ব্ল্যাক টাইগার চিংড়িও বলা হয়ে থাকে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরশাপাতি আম

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরশাপাতি আমকে জিআই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের আবেদন করেছিল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যা ২০১৯ সালে স্বীকৃতি পায়। গোল ও মাঝারি আকৃতির রসালো আমটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি আঁশহীন, গন্ধ বেশ আকর্ষণীয় এবং স্বাদে খুব মিষ্টি। ফলের খোসা সামান্য মোটা, তবে আঁটি পাতলা। এ কারণে আমটির ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ খাওয়া যায়। সাধারণত জুন মাসের শুরু থেকে আম পাকা শুরু করে। এই আমের ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব হতে চার মাস সময় দরকার হয়।

ফজলি আম

বাংলাদেশে উৎপন্ন আমের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আকৃতির আম হচ্ছে ফজলি। রাজশাহীস্থ ফল গবেষণা ইনস্টিটিউটের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালে এটি জিআই নিবন্ধন পায়। ফজলি আম লম্বায় ১২ ও প্রস্থে ৫ সেন্টিমিটারের বেশি থাকে।

ঢাকাই মসলিন

মসলিনের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। এক সময় এটিই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কাপড়। বলা হয়ে থাকে, মসলিন শাড়ির বুনন এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে পুরো একটি শাড়ি আংটির ভেতর দিয়ে এপার-ওপার করা যেত। প্রাচীন আমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ-সম্রাট থেকে শুরু করে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মসলিন কাপড় পরতেন। মিশরে মমি করা শরীর ঢাকাই মসলিনে আবৃত করা হতো। সতেরো শতকে মোগল আমলে এই কাপড়ের উৎপাদন ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। লন্ডনে ১৮৫০ সালে ঢাকাই মসলিনের শেষ প্রদর্শনী হয়েছিল। ২০২১ সালে সেই আদি মসলিন বাংলাদেশে আবারও উৎপাদিত হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে এসেও এই শাড়ি তৈরিতে তাঁতিদের হাতে কাটা ৫০০ কাউন্টের সুতাই ব্যবহার করতে হয়েছে। কাপড়ও বোনা হয়েছে হস্তচালিত তাঁতে। ভারতেও এখনো মসলিন তৈরি হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকাই মসলিনের বিশেষত্বই আলাদা ও বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো) ঢাকাই মসলিনকে জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন করার জন্য ডিপিডিটির কাছে আবেদন করলে সেটি ২০২০ সালে স্বীকৃতি পায়। সংস্থাটি জানায়, তারা ছাড়া প্রকৃত মসলিন কাপড় বর্তমানে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে না।

রাজশাহী সিল্ক

রাজশাহী সিল্ককে জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ২০১৭ সালে আবেদন করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। ২০২২ সালে মিলেছে এর স্বীকৃতি। রেশম কাপড়ের একটি ধরন এই রাজশাহী সিল্ক। এটি মালবেরি সিল্ক। মালবেরির বাংলা হলো তুঁতগাছ। ২০-২২ দিন এই গাছের পাতা খাওয়ার পর রেশম পোকার মুখ থেকে যে লালা নিঃসৃত হয়, তা থেকেই তৈরি হয় রেশম গুটি। এই গুটি থেকে রিলিং মেশিনের মাধ্যমে সুতা বা কাঁচা রেশম উত্তোলন করা হয়। সেই কাঁচা রেশমকে বিভিন্ন উপায়ে প্রক্রিয়া করে তাঁত মেশিনে বুনে তৈরি করা হয় রাজশাহী সিল্ক। কাপড় বোনার পর বিভিন্ন রং দিয়ে ডাইং ও প্রিন্টিং করা হয়। অনেক সময় কাপড় বোনার আগে সুতা রং করা হয়ে থাকে। এ কারণে রাজশাহী সিল্ক দেখতে বেশ উজ্জ্বল ও চকচকে। রাজশাহীর বোয়ালিয়া বন্দরে এই রেশমের চাষ হতো সবচেয়ে বেশি। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রাজশাহী সিল্ক রপ্তানি হতো। এখন নতুন করে এর রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

রংপুরের শতরঞ্জি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ২০১৯ সালে ডিপিডিটির কাছে রংপুরের শতরঞ্জির জিআই স্বীকৃতির আবেদন করেছিল। ২০২২ সালে স্বীকৃতি আসে। রংপুরের ঘাঘট নদের তীরে তৈরি হতো এই শতরঞ্জি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এ এলাকায় শতরঞ্জির প্রচলন ছিল। মাটির ওপর সুতা টানা দিয়ে বাঁশ এবং রশির ওপর হাতে নকশা করে তৈরি হতো শতরঞ্জি। এ অঞ্চলের শতরঞ্জির প্রসারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংরেজ কালেক্টর নিসবেটের নাম। ১৮৪০ সালের দিকে তৎকালীন রংপুর জেলার কালেক্টর ছিলেন নিসবেট। পীরপুর গ্রামে সে সময় রং-বেরঙের সুতার গালিচা বা শতরঞ্জি তৈরি করা হতো। শতরঞ্জি দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং এ শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সহায়তা দেন এবং বিপণনের ব্যবস্থা করেন। এই ভূমিকার জন্যই নিসবেটের নামানুসারে পীরপুরের নাম হয় নিসবেতগঞ্জ। ব্রিটিশ শাসনামলে শতরঞ্জি এত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে যে এখানকার তৈরি শতরঞ্জি সমগ্র ভারতবর্ষ, বার্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। ১৯৭৬ সালে বিসিক নিসবেতগঞ্জ গ্রামে শতরঞ্জি তৈরির একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। পরে ১৯৯৪ সালে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে ওই এলাকার মানুষদের শতরঞ্জি উৎপাদনে উদ্‌বুদ্ধ করে। সেই থেকে রংপুরের শতরঞ্জি ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার প্রায় ৩৬টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

কালিজিরা ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই পণ্যকে জিআই হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন জানিয়েছিল, যা স্বীকৃতি পেয়েছে ২০২১ সালে। কালিজিরা ধানের খোসা কালচে হলেও চালের রং সাদা। এই জাতের ধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি খুব ছোটো এবং সুগন্ধযুক্ত। দানার আকৃতি ছোটো আবার খোসা কালো হওয়ার কারণে একে দেখতে অনেকটা কালিজিরা মসলার মতো মনে হয়, তাই এর এমন নাম। এই চাল দিয়ে মূলত ভাত, পোলাও, পায়েস বা ফিরনি তৈরি করা হয়। এই ধানের উৎপত্তিস্থল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে। তবে স্বাদ ও সুগন্ধির কারণে এই চাল জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় সারা এর দেশে চাষ হয়। সাধারণত শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাস অর্থাৎ আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে কালিজিরার চারা রোপণ করতে হয়। আর ১০ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ফসল কাটা হয়।

দিনাজপুরের কাটারিভোগ

দিনাজপুরের কাটারিভোগ ধান জিআই হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন জানিয়েছিল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এই বছর পাওয়া গেছে স্বীকৃতি। কালিজিরার মতো এই ধানের বৈশিষ্ট্য হলো এ থেকে উৎপাদিত চাল সরু ও সুগন্ধযুক্ত। এটি সারা বাংলাদেশে উৎপাদিত হলেও সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয় ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মাগুরা ও সিলেট জেলায়। তবে এই ধানের মূল উৎপত্তিস্থল দিনাজপুরে। দিনাজপুর ছাড়া অন্য এলাকায় চাষ হলে সুগন্ধ কমে যায়। দিনাজপুরে উৎপাদিত আমন ধানের মধ্যে কাটারিভোগ অন্যতম। এ কারণে দিনাজপুরের কাটারিভোগ পণ্যটিকেই এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চাষাবাদের অনুকূল পরিবেশ থাকায় দিনাজপুরে প্রাচীনকাল থেকেই কাটারিভোগ চাষাবাদ হয়ে আসছে। শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাস অর্থাৎ আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে চারা রোপণ করতে হয়। ডিসেম্বরের ১০ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে ফসল কাটা হয়।

বিজয়পুরের সাদা মাটি

নেত্রকোণার এই প্রাকৃতিক সম্পদকে জিআই স্বীকৃতি দিতে নিবন্ধনের আবেদন করেছিল নেত্রকোণা জেলা প্রশাসনের কার্যালয়, যা ২০২১ সালে এসে স্বীকৃতি পায়। সিরামিকের বাসন-কোসন, টাইলস, গাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে এই উৎকৃষ্ট মানের সাদামাটি। নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে সাদা মাটির বিপুল মজুত আছে। এই মাটির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, এটি প্রাকৃতিকভাবেই কেওলিন বা অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে সিলিকা বালুসহ আরও অনেক খনিজ পদার্থ রয়েছে। স্থানভেদে মাটির বৈশিষ্ট্য ও মান ভিন্ন ভিন্ন হয়। কালো, ধূসর ও লাল

রঙের এই মাটি শুকনো অবস্থায় মধ্যম মাত্রার শক্ত ও ভঙ্গুর হয়। ভেজা অবস্থায় এই মাটি বেশ মসৃণ, নরম ও আঠালো। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ১৯৫৭ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানায় ভেদিকুরায় প্রথম সাদা মাটির সন্ধান পাওয়া যায়। দুর্গাপুর বর্তমানে নেত্রকোণার একটি উপজেলা। উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর ওপারেই সাদা মাটির পাহাড়ের অবস্থান। এখানে ১৬৩টি সাদা মাটির টিলা রয়েছে।

অধ্যায় ৩

পর্যটক নিরাপত্তা ও স্মার্ট পর্যটন গন্তব্য

Tourist Safety & Smart Tourism Destination

পর্যটন নিরাপত্তা

সাধারণভাবে পর্যটন নিরাপত্তা বলতে পেশাদার, অভিজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের দ্বারা গঠিত একটি পরিকল্পনাকে বোঝায় যা গন্তব্যস্থল ও পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য গঠিত হয়। পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে পর্যটন নিরাপত্তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

Maximiliano E. Korstanje এর মতে, 'Tourism security can be understood as a sub-discipline formed by professionals, scholars and policymakers oriented to protect or enhance the security of destinations and tourist.'

Peter E Tarlow এর মতে, 'Tourism security is and invaluable resource for private security professionals, police departments that serve tourist destinations and tourism professionals who work in hotels or convention centers, or at attractions, casinos, or events.'

পর্যটনের গুরুত্ব ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পর্যটন সুরক্ষায় পর্যটন পুলিশিংয়ের ধারণাও ছড়িয়ে পড়ে। ড. পিটার ই টারলো, প্রেসিডেন্ট অব ট্যুরিজম, টেক্সাস, ইউএসএ তার 'Tourism Security and Police-Important Part of Destination Image' প্রবন্ধে পর্যটন সংশ্লিষ্ট পুলিশিং সম্পর্কে বলেছেন, 'ট্যুরিস্ট

পুলিশ ইউনিট শুধুমাত্র পর্যটকদের নিরাপত্তাই প্রদান করে না, একই সাথে তারা একটি যথার্থ পর্যটন শিল্পের চিত্র তুলে ধরে।'

বাংলাদেশের 'জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০' এর অনুচ্ছেদ ৬.৯-এ পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ট্যুরিস্ট স্পটসমূহে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ ট্যুরিস্ট পুলিশ ও প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী নিয়োজিতকরণের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর 'ট্যুরিস্ট পুলিশ' নামে বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করা হয়। পর্যটকদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে পর্যটন শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ট্যুরিস্ট পুলিশ অবদান রেখে চলছে।

পর্যটন গন্তব্য

পর্যটন গন্তব্য হলো একটি আকর্ষণীয় স্থান যেখানে পর্যটকরা পরিদর্শন করে, সাধারণত এর অন্তর্নিহিত বা একটি প্রদর্শিত প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক মূল্য, ঐতিহাসিক তাৎপর্য, প্রাকৃতিক বা নির্মিত সৌন্দর্য, অবসর এবং বিনোদনের জন্য।

নিরাপদ গন্তব্য

ভ্রমণ এবং পর্যটনের জন্য নিরাপত্তা সবসময়ই একটি অপরিহার্য শর্ত। তবে গত দুই দশকে সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো অনেক বড়ো গুরুত্ব অর্জন করেছে। পর্যটনে নিরাপত্তার সমস্যাগুলো ১৯৫০ দশকের গোড়া থেকেই গণপর্যটনের বিবর্তনের মাধ্যমেই সবার সামনে চলে আসে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ করা যায়।

- পর্যটন এখন আর কেবল উচ্চবিত্ত শ্রেণির অবকাশযাপনের বিষয় নয় বরং মধ্যবিত্তরা ক্রমান্বয়ে এই শিল্পের সাথে জড়িত হয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয় বৃদ্ধি এবং অবকাশযাপনের ইচ্ছা থেকে তারা ভ্রমণে আগ্রহী হয়েছে
- কেবল উন্নত দেশগুলোই নয় বরং তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বর্তমানে পর্যটন শিল্পে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং এটি তাদের জন্য পর্যটন অর্থনৈতিক বিকাশে অন্যতম একটি কৌশল
- বিমান এবং অন্যান্য দ্রুতগামী পরিবহণব্যবস্থা বৃদ্ধির ফলে বৈশ্বিক ভৌগোলিক দূরত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে

উপরোক্ত বিষয়গুলোর কারণে পর্যটন বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে যেখানে নিরাপত্তা ইস্যু একটি বড়ো গুরুত্ব বহন করে। নিরাপত্তার কথাটি মাথায় রেখেই পর্যটকগণ তাদের গন্তব্য নির্বাচন করেন। ভ্রমণের প্রস্তুতির পর্যায়ে বেশির ভাগ পর্যটক ও দর্শনার্থী জানতে চান যে, গন্তব্যস্থলের পর্যটন কর্তৃপক্ষ তাদের সুরক্ষার জন্য কী কী ব্যবস্থা রেখেছে এবং কোনো নিরাপত্তা সমস্যা দেখা দিলে তাদের বাউন্স ব্যাক করার কতটুকু প্রস্তুতি রয়েছে। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অভাব শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তির অবকাশযাপনকে বাধাগ্রস্ত করে না বরং এটি একটি পর্যটন শিল্পকেও ধ্বংস করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পর্যাপ্ত সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার মিলিত রূপই একটি গন্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

সেইফ সিটি ইনডেক্স

দ্রুত নগরায়ণের ফলে বর্তমান পৃথিবীর ৫৬% লোক শহরে বাস করে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ তা ৬৮%-এ উন্নীত হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সর্বাধিক নগরায়ণ ঘটেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে নগর ব্যবস্থাপনা মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। শহরের বাসিন্দা, তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও দর্শনার্থী এবং পর্যটকদের সুরক্ষা প্রদান নগর ব্যবস্থাপনার অন্যতম দায়িত্ব। নগর সুরক্ষার ওপর গুরত্ব দিয়ে সম্প্রতি লন্ডনভিত্তিক প্রকাশনা 'দ্য ইকোনমিস্ট'-এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিট 'নিরাপদ নগরী তালিকা'-২০২২ প্রকাশ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে তারা ৫৭টি নিরাপত্তা সূচক বিবেচনা করে ৬০টি নগরীর পর্যায় তালিকা প্রকাশ করেছে।
৫৭টি নিরাপত্তা সূচকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৫টি সূচক প্রধান–

ডিজিটাল নিরাপত্তা

কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেমে যে অপরাধ সংঘটিত হয় যেমন কারও কম্পিউটার সিস্টেমে বেআইনি প্রবেশ, তথ্য-উপাত্ত সংযোজন-বিয়োজন, হ্যাকিং ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য যে নিরাপত্তাব্যবস্থা তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা বলে।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা

স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার জন্য যে নিরাপত্তাব্যবস্থা যেমন বিশুদ্ধ বাতাস, নিরাপদ খাদ্য, স্যানিটেশন, পর্যাপ্ত সবুজ এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় পর্যাপ্ত ফার্স্ট এইড ব্যবস্থা নিশ্চিত করাকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বলে।

অবকাঠামো নিরাপত্তা

কোনো নিরাপদ গন্তব্যের অবকাঠামোগত বিষয় যেমন আবাসিক ব্যবস্থাপনা, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদির নিরাপত্তামূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করাকে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা বলে।

ব্যক্তি নিরাপত্তা

ব্যক্তির নিরাপত্তা ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের দ্বারা নিশ্চিত করা একটি মৌলিক অধিকার। এটি হিউম্যান রাইটস সম্পর্কিত ইউরোপীয় কনভেনশন, কানাডার সংবিধান, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান এবং সারাবিশ্বের অন্যান্য আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা এবং সুরক্ষিত একটি মানবাধিকার। সাধারণভাবে ব্যক্তির নিরাপত্তা অধিকার স্বাধীনতার সাথে জড়িত এবং হেবিয়াস কর্পাসের মতে, প্রতিকারের সাথে যদি কাউকে অবৈধভাবে কারাবন্দি করা হয় তবেও সেই অধিকারটি অন্তর্ভুক্ত থাকে। অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে ব্যক্তির নিরাপত্তা অধিকারের প্রসার হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

পরিবেশগত নিরাপত্তা

পরিবেশগত নিরাপত্তা হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা এবং নাগরিক, সমাজ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাব, প্রতিকূল প্রক্রিয়া এবং উন্নয়নের প্রবণতা যা মানব স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের টেকসই কার্যকারিতা এবং মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। বর্তমানে একটি শহর কতটা নিরাপদ এবং কোন শহরগুলো নিরাপত্তা রক্ষায় সঠিক কাজ করছে তা এই সূচকগুলো দিয়ে নির্ধারণ করা হয়।

পর্যটকদের শারীরিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

সাধারণ সুরক্ষা

যেকোনো পর্যটন আবাসনের পরিচ্ছন্নতা ও হাইজিনের প্রতি সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে। রান্না ও খাবার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ পর্যটকদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে রেস্টুরেন্টসমূহকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। একইভাবে গোসল ও পানীয় জল সরবরাহে হোটেলগুলোকে সচেতন ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সুস্থতা বিধানে হোটেল ও রেস্টুরেন্টের এই দায়িত্বে অবহেলা মারাত্মক অবস্থা তৈরি করতে পারে। এর পাশাপাশি পর্যটকদের জরুরি চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স এবং জরুরি চিকিৎসক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রাখা পর্যটন আবাসনের দায়িত্ব।

সাধারণ নিরাপত্তা

পর্যটকদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি ট্যুরিস্ট পুলিশের সহায়তা গ্রহণের ব্যাপারে পর্যটন আবাসন সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে। একই রকমভাবে ট্যুরিস্ট পুলিশেরও দায়িত্ব চাহিদা মোতাবেক যেকোনো সমস্যায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে পর্যটকদের শারীরিক ও সম্পদ রক্ষায় তাদের পাশে দাঁড়ানো।

নিরাপত্তা কর্মী

প্রত্যেক পর্যটন আবাসনের নিজস্ব প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নিরাপত্তা কর্মী থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ পর্যটকদের প্রাথমিক নিরাপত্তার দায়িত্ব আবাসন কর্তৃপক্ষের। এ সকল নিরাপত্তা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ ও মহড়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

জরুরি প্রস্তুতিসমূহ

পর্যটকদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য অগ্নি নির্বাপণ, মশা ও পোকা-মাকড় নিধন এবং অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি জাতীয় জরুরি সেবা আবাসন কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি একজন প্রতিবন্ধী পর্যটকের চলাচল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সেবা নিশ্চিত করার আবাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক

কোনো পর্যটক পর্যটনকেন্দ্রে গমন করলে তিনি ওই এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে নানাভাবে আন্তঃক্রিয়া বা মতবিনিময় করেন। তাই পর্যটনে পরোক্ষ নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারেন। আবাসন কর্তৃপক্ষ, রেস্টুরেন্ট, গাইড, বিনোদন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেরই উচিত স্থানীয় জনগণের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা এবং তাদেরকে পর্যটকদের নিরাপত্তায় সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্‌বুদ্ধ করা। পাশাপাশি ট্যুরিস্ট পুলিশেরও এই দায়িত্ব পালনে সমানভাবে অংশীদার হওয়া।

উপর্যুক্ত নিরাপত্তা ছাড়াও পর্যটকরা বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, নৌঘাট/নৌবন্দর/সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে নানাবিধ ছোটো-বড়ো নিরাপত্তা সমস্যায় পড়তে পারেন। এই সকল ক্ষেত্রে স্থলভাগে ট্যুরিস্ট পুলিশ এককভাবে এবং জলাভূমি পর্যটনের ক্ষেত্রে নৌ-পুলিশের সাথে যৌথভাবে পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় দেশি বা বিদেশি কোনো পর্যটক নিরাপত্তা সমস্যায় পড়লে বিজিবির সাথে যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে পর্যটকদের রক্ষা করতে হবে। একটি গন্তব্যের অবিন্যস্ত ভৌত ও উপরিকাঠামো পর্যটকদের সাধারণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। যেমন ভাঙা ও সরু পথ যানবাহন চলাচলে

সংকট তৈরি করে এবং দুর্ঘটনা বাড়ায়। তাই অন্তত পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট চলাচলের জন্য উপযোগী করে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত জরুরি। পর্যটকদেরকে সার্বিক নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তার অংশ। একটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা যত কার্যকর, ওই দেশে পর্যটকদের নিরাপত্তা ততটাই কার্যকর। পর্যটকরা ভ্রমণকালে প্রকৃতপক্ষেই স্বাগত জনগোষ্ঠীর অংশ হয়ে ওঠে। তাই স্বাগত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে পর্যটকদের জন্য খুব বেশি আলাদা করে নিরাপত্তা ভাবনার প্রয়োজন হয় না। হয়রানি, অপরাধ ও সন্ত্রাস এই ৩টি বিষয় সকলেরই নিরাপত্তা বিঘ্ন করে।

সবশেষে, একটি গন্তব্যে পর্যটকদের মানবীয় নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবেশ, প্রতিবেশ, শিক্ষাগত অবস্থা, পর্যটন শিল্পে সুষ্ঠু কর্মসংস্থানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও পর্যটন সুবিধাদি সাধারণের মধ্যে বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি একটি স্থানে পর্যটকদের মানবীয় নিরাপত্তা তৈরি করে।

পর্যটন নিরাপত্তা ব্যবস্থা

গন্তব্যের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এর বহুমুখী অবয়ব পর্যটকদের কাছে ধরা পড়ে। চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং গন্তব্যের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য এর অবয়বের পরিবর্তন সাধন করতে হয়। আবার সময়ের সাথে সাথে কোনো কোনো গন্তব্যের অবয়ব প্রাকৃতিকভাবেই পরিবর্তিত হয়। মোট কথা, গন্তব্যের আকর্ষণ ও অবয়ব পরিবর্তনশীল। তবে একটি পর্যটন গন্তব্যের সার্থকতা নির্ভর করে পর্যটকরা কী চোখে তাকে দেখে, ওই গন্তব্যে অবস্থানকালীন সময়ে কীভাবে উপভোগ করেন এবং পর্যটন শিল্প উক্ত গন্তব্যকে কীভাবে প্রমোশন ও মার্কেটিং পরিকল্পনা করে তার ওপর। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ধারণাও গন্তব্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একটি পর্যটন গন্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল কিছু উপাদান যেমন– অবকাঠামো, আকর্ষণ, পর্যটকদের জন্য সুবিধাদি, পরিবহণ ও আতিথেয়তা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়। তাই এর আচরণ হয় ওই সকল উপাদানের সংমিশ্রিত এক জটিল রূপ যা একটিমাত্র সংজ্ঞার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় না। গন্তব্যের আচরণের সাথে সম্পৃক্ত উপাদানগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

- গন্তব্যের ভৌত অবস্থান ও এর সীমাবদ্ধতা
- গন্তব্যের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও মনুষ্য নির্মিত আকর্ষণের ধরন ও বিকাশের সুযোগ
- গন্তব্যের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা
- সেবা সরবরাহ অনুযায়ী কোন ধরনের পর্যটন পরিচালনা সম্ভব

- পর্যটকদের চাহিদা মোকাবিলায় এর গতিশীল সক্ষমতা
- পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক গন্তব্য সম্বন্ধে ধারণা
- পর্যটকগণ কর্তৃক গন্তব্যের মূল্যায়ন
- বাজারজাতকরণ বহুমুখিতা
- পর্যটন সৃষ্টিতে গন্তব্যের সক্ষমতা
- গন্তব্যের সম্ভাব্য জীবনচক্র বা আয়ু
- আইনি প্রয়োগ দ্বারা গন্তব্যটি কতটুকু নিরাপদ

চলতি শতাব্দীতে মনুষ্য নির্মিত সংকটাবলির জন্য আমাদের জনজীবনে শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তা বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে আবির্ভূত হয়েছে, যা কখনো কখনো চ্যালেঞ্জ বলে প্রতীয়মান হয়। পর্যটন গন্তব্যও এর বাইরে নয়। পর্যটকদের মনের মধ্যে সর্বদা একটি প্রশ্ন উঠে আসছে, যেখানে যখন যেভাবে যাচ্ছি, তা কি নিরাপদ? প্রকৃতপক্ষে এর সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে পর্যটন গন্তব্যে ও পর্যটকদের প্রতি যত্নশীল থাকা ও রক্ষণাবেক্ষণের আরেক নাম নিরাপত্তা। সঠিক উপায়ে সম্পদের যত্ন নিতে না পারলে গন্তব্যে যেতে পর্যটকদের মনে ভীতির সঞ্চার হতে পারে। ফলে গন্তব্যের রাজস্ব, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও ইমেজ হ্রাসসহ মানবিক পরাজয় পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই বিচেনায় যত্ন, আতিথেয়তা ও নিরাপত্তা প্রায় সমার্থক।

একটি গন্তব্যের আচরণের ওপর ভিত্তি করে তিন প্রকার নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে–

একক নিরাপত্তাব্যবস্থা

এই ধরনের নিরাপত্তা গড়ে তোলার দায়িত্ব এককভাবে ট্যুরিস্ট পুলিশের। গন্তব্যের সকল উপাদানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। কেননা উক্ত উপাদানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সামগ্রিকভাবে একটি গন্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পর্যটন উৎপাদনের ক্ষমতা হারাবে।

সমন্বিত নিরাপত্তাব্যবস্থা

ট্যুরিস্ট পুলিশ এই ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যটন স্টেকহোল্ডার ও স্বাগত জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলতে পারে। এটি অত্যন্ত টেকসই নিরাপত্তাব্যবস্থা হতে পারে। এই জাতীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যটন গন্তব্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনেক বেশি কার্যকর।

সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা

কমিউনিটি পুলিশিংয়ের আদলে এই ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় পর্যটন গন্তব্যেও সকল সম্পত্তিতে তাদের মালিকানা ও লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলেই তারা এ কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী একবার গড়ে তুলতে পারলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

গন্তব্যের নিরাপত্তার জন্য যে সকল বিষয়কে বিবেচনায় আনতে হবে, তা নিম্নরূপ–

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাজনিত নিরাপত্তা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যটন গন্তব্য বা পর্যটন আবাসনের কিছু ক্ষতি করতে পারে। যেমন সুনামি, আইলা কিংবা বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি অবশ্যই পর্যটনের ব্যাপক ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যও হতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যটনের যে সকল ক্ষতি সাধন করে, তার নিরাপত্তা দিতে না পারলে এই শিল্পে বিনিয়োগকারী ও কর্মী সকলেই ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। দেশে পর্যায়ক্রমে ট্যুরিজম রিফিউজির সংখ্যা বেড়ে যাবে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক নিরাপত্তা

একটি পর্যটন গন্তব্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক নিরাপত্তা অত্যন্ত দরকারি। নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ, জরুরি চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাশাপাশি সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থাকেও জোরদার করতে হবে। তা না হলে কোনো সংক্রামক রোগ গন্তব্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সন্ত্রাসের বিপরীতে নিরাপত্তা

স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ কোনো অবস্থাতেই যেন পর্যটন গন্তব্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, সে বিষয়ে দেশের আইন কাঠামোকে আরও বেশি জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি প্রচলিত আইনের কঠোরতম প্রয়োগ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত থাকে। তাই শুরুতে এক সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে একটি পর্যটন গন্তব্য নানা দিক থেকে তার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে

অপরাধজনিত কারণে নিরাপত্তা

পর্যটক বা গন্তব্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত একক বা যৌথ অপরাধকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। তা না হলে পর্যটকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়বে।

এমনকি এটি যদি একটি সামান্য ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতিও হয়। মনে রাখতে হবে যে, পর্যটকরা সবসময়ই ব্যক্তিগত ঝুঁকির বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়। তাই তাদের মধ্যে কোনো প্রকার শঙ্কা বা দ্বিধা তৈরি করা থেকে দূরে থাকতে হবে। এটাও ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'Safety sells in tourism'। ডিজিটাল, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, ব্যক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সঠিক ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব। ড. পিটার ই টারলো, প্রেসিডেন্ট অব ট্যুরিজম, টেক্সাস, ইউএসএ তার 'Tourism Security and Police Important Part of Destination Image' প্রবন্ধে পর্যটন সংশ্লিষ্ট পুলিশিং সম্পর্কে বলেছেন, 'ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট' শুধুমাত্র পর্যটকদের নিরাপত্তাই প্রদান করে না, একই সাথে তারা একটি যথার্থ পর্যটন শিল্পের চিত্র তুলে ধরে। পর্যটন নিরাপত্তায় বর্তমানে পৃথিবীতে ৩১টি দেশে ট্যুরিস্ট পুলিশ তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একনজরে আমরা দেখে নিই তাদের নাম–

ক্রম	দেশের নাম	ক্রম	দেশের নাম
১	বাংলাদেশ	১৭	তুর্কি
২	দুবাই	১৮	তাজাকিস্তান
৩	ভারত	১৯	উজবেকিস্তান
৪	ইন্দোনেশিয়া	২০	ব্রাজিল
৫	আয়ারল্যান্ড	২১	বেলিজি
৬	কাজাখস্তান	২২	পেরু
৭	মালয়েশিয়া	২৩	ইএসএ পার্ক পুলিশ
৮	মায়ানমার	২৪	নিউজিল্যান্ড
৯	মালদ্বীপ	২৫	গ্রিস
১০	নেপাল	২৬	রাশিয়া
১১	পাকিস্তান	২৭	সুইজারল্যান্ড
১২	ফিলিপাইন	২৮	মিশর
১৩	সাউথ কোরিয়া	২৯	কেনিয়া
১৪	শ্রীলঙ্কা	৩০	লিবিয়া
১৫	সিঙ্গাপুর	৩১	উগান্ডা
১৬	থাইল্যান্ড		

অধ্যায় ৪

টেকসই পর্যটন

Sustainable Tourism

টেকসই পর্যটন হলো একটি সাংগঠনিক নীতি, যার লক্ষ্য পর্যটন উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূরণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে সহনশীল রেখে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুসেবা প্রদান করা। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্থিতিশীল রেখে ও জীববৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ন রেখে পর্যটন শিল্পে উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। অন্যভাবে টেকসই পর্যটন বলতে পর্যটক, পর্যটন শিল্প, পরিবেশ এবং আয়োজক সম্প্রদায়ের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনা করে এটিকে পর্যটন ক্রিয়াকলাপের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

টেকসই পর্যটন পর্যটনের বিশেষ কোনো শাখা নয়। এটিকে পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত যা সমগ্র পর্যটন খাতকে গাইড করতে হবে। কারণ পর্যটনে টেকসইতা শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষার জন্যই নয়, এই খাতের ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইকো-ট্যুরিজম (Eco-Tourism)

ইকো-ট্যুরিজম হলো পর্যটন ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাবকে ন্যূনতম রেখে স্থানীয় জনগণ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পর্যটকদের জন্য সর্বাধিক বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইকো-ট্যুরিজম তথা পরিবেশগত পর্যটনের গুরত্ব অপরিসীম। কারণ ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে একজন প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ দায়িত্বশীল

ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছপালা, পশুপাখি ও প্রকৃতির যে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য অধ্যয়ন ও উপভোগ করে। ইকো-ট্যুরিজম প্রবর্তন ও প্রচারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পরিবেশের সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

ইকো-ট্যুরিজম চারটি স্তম্ভের কথা বলে–

ক. ন্যূনতম পরিবেশগত প্রভাব
খ. স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত না করা
গ. ভ্রমণকারী দেশের সর্বনিম্ন স্থর থেকে আর্থিক বিকাশ সাধন
ঘ. পর্যটকদের সর্বাধিক বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া

ব্লু ইকোনমি (Blue Economy)

Blue Economy অর্থনীতির এমন একটি বিষয় যেখানে একটি দেশের সামুদ্রিক পরিবেশ কিংবা সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি হচ্ছে সমুদ্রের সম্পদনির্ভর অর্থনীতি। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও এর তলদেশের বিভিন্ন প্রকার সম্পদকে কাজে লাগানোর অর্থনীতি।

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের অধিকারী বাংলাদেশের বিরাট সমুদ্রতট পর্যটনে টেকসই উন্নয়ন সাধন করতে পারে। বাংলাদেশে অবশ্য উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রকেন্দ্রিক পর্যটন ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো এটা অনেক কম। এ খাতে বাংলাদেশের আয় এখনো অনেক কম। স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে যে পর্যটন স্পটগুলো রয়েছে সেগুলোর উন্নতি সাধন করতে হবে। পর্যটনের জন্য খুলনা ও চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্রে বিলাসবহুল ক্রুজশিপ চালু করা যেতে পারে। এসব এলাকায় সার্ফিং জোন, পানির নিচের পর্যটন, একটি কমিউনিটিভিত্তিক যোগাযোগ স্থাপন, বিভিন্ন এজেন্সির ভেতর আন্তঃসম্পর্ক একান্ত প্রয়োজন।

উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জিডিপি বাড়াতে পারে, নতুন কাজ সৃষ্টি করতে পারে, দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এসব ছাড়াও স্থানীয় সংস্কৃতি বিকাশের একটি মাধ্যমও সামুদ্রিক পর্যটন। এজন্য অন-এরাইভাল ভিসাসহ অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়া প্রয়োজন।

শুধু পর্যটন বা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নয়, বরং বায়োটেকনোলজি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অপ্রচলিত সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ করেও ব্লু ইকোনমিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ব্লু জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছের স্বাদ বৃদ্ধি করা যায়, উচ্চ ফলনশীল মাছের প্রকরণ আলাদা করা সহজ হয়, জিনগত পরিবর্তন করে মাছের বেড়ে ওঠা প্রভাবিত করা যায়। এছাড়া সমুদ্র থেকে পাওয়া দ্রব্য থেকে জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে খাবার, ওষুধ, পশুর খাবার এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদিও পাওয়া সম্ভব। এগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দ্রব্য যেমন কসমেটিক্স, সাপ্লিমেন্ট, এনজাইম, কৃষির রাসায়নিক ব্যবহার করা সম্ভব।

জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা টেকসই পর্যটনের লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ বর্ণনা করে

পরিবেশগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, যা পর্যটন উন্নয়নের একটি মূল উপাদান, মৌলিক পরিবেশগত প্রক্রিয়া বজায় রাখা এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়তা করা।

আয়োজক সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্যতাকে সম্মান করা, তাদের বসতি স্থাপন করা এবং জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ রক্ষা করা, আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং সহনশীলতায় অবদান রাখা। টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করতে, স্থিতিশীল কর্মসংস্থান এবং আয় উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করতে, হোস্ট সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক পরিষেবাসহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের ন্যায়সংগত আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রদান করতে ও দারিদ্র্য হ্রাসে টেকসই পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

টেকসই পর্যটনের নীতি

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) এবং জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) ২০০৫ সালে যৌথভাবে প্রকাশিত গাইডের সাথে টেকসই পর্যটনের জন্য ১২টি নীতি নির্ধারণ করে। এই গাইডে তালিকাভুক্ত টেকসই পর্যটন নীতিগুলো হলো:

অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা

পর্যটন গন্তব্য এবং এন্টারপ্রাইজগুলোর অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং প্রতিযোগিতা বজায় রাখা যাতে তারা দীর্ঘমেয়াদে বিকাশ এবং উপকৃত হতে পারে।

স্থানীয় কল্যাণ

হোস্ট গন্তব্যে পর্যটনের অবদান বাড়াতে দর্শনার্থীদের স্থানীয় ব্যয়ের হার বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের মানবজাতি, লিঙ্গ অক্ষমতার মতো বিষয়গুলোতে বৈষম্য ছাড়াই মজুরি স্তর এবং পরিষেবার মান উন্নত করে পর্যটন খাত দ্বারা তৈরি এবং সমর্থিত স্থানীয় চাকরির সংখ্যা এবং গুণমান বৃদ্ধি করা।

সামাজিক সমতা

পর্যটন থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাগুলো সমাজে ব্যাপকভাবে এবং ন্যায্যভাবে বিতরণ করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত লোকদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ, আয় এবং পরিষেবার উন্নতি নিশ্চিত করা।

দর্শক সন্তুষ্টি

লিঙ্গ, জাতি, অক্ষমতা বা অন্যান্য পার্থক্য নির্বিশেষে সমস্ত দর্শকদের একটি নিরাপদ এবং সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ

তাদের অঞ্চলে পর্যটন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করুন।

সমাজকল্যাণ

সামাজিক অবক্ষয় এবং অপব্যবহার রোধ করার সাথে সাথে সামাজিক কাঠামো এবং সম্পদ, সুযোগ এবং জীবন সহায়তা ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস প্রদান করে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা এবং উন্নত করা।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, প্রামাণিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্বাগতিক সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যকে সম্মান ও সমৃদ্ধ করা।

শারীরিক অখণ্ডতা

শহুরে এবং গ্রামীণ উভয় এলাকার ল্যান্ডস্কেপ গুণমান সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধ করা। পরিবেশ ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।

জীববৈচিত্র্য

প্রাকৃতিক এলাকা, আবাসস্থল এবং বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা এবং তাদের ক্ষতি কমাতে সহায়তা করা।

সম্পদ দক্ষতা

পর্যটন সুবিধা এবং পরিষেবাগুলোর বিকাশ এবং পরিচালনায় সীমিত, অনবায়নযোগ্য সংস্থানগুলোর ব্যবহার হ্রাস করা

পরিবেশগত বিশুদ্ধতা

পর্যটন প্রতিষ্ঠান এবং দর্শনার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট বায়ু, জল এবং ভূমি দূষণ এবং বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করা।

বাংলাদেশে টেকসই পর্যটনের গুরুত্ব

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পর্যটন শিল্পের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ টেইসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৩টি প্রত্যক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ২০৪১ সালে পৌঁছে যাবে উন্নত আয়ের দেশে।

পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্প, তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে এই শিল্প অনন্য ভূমিকা পালন করছে। পর্যটনকে বিশ্বমানে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে, যার মধ্যে পর্যটন নগরী কক্সবাজার অন্যতম। যা করে পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে এবং বাড়বে কর্মসংস্থান। সরকারি উদ্যোগে মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বদলে যাবে বাংলাদেশের অবকাঠামো ও যোগাযোগব্যবস্থা। পর্যটন নগরী কক্সবাজারে তিনটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই তিনটি ট্যুরিজম পার্ক হলো সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক। এই ট্যুরিজম পার্কগুলোতে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছরে বাড়তি আয় হবে প্রায় ২শত কোটি মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করার জন্য গ্রামীণ পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি-২০৩০) অর্জন ত্বরান্বিত করতে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম, জেলাভিত্তিক পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন ও হাওড় পর্যটন উন্নয়নের মধ্য দিয়ে একতা, সাম্য ও সহযোগিতার প্রত্যয় বৃদ্ধি করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন

শিল্প বাংলাদেশে জাতীয় উন্নয়নে বড়ো অবদান রাখতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পর্যটন প্রসার প্রয়োজন। অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করলে সমবায় পর্যটন, কমিউনিটি বেইজড পর্যটন আরও সম্প্রসারিত হবে। গ্রামের মানুষের মধ্যে মমত্ববোধ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, একতা, সাম্য বৃদ্ধি পাবে যা বর্তমানে চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহযোগিতা করবে এবং বাস্তবায়িত হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।

পর্যটন শিল্পের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যটন বির্নিমাণে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

- ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানের জন্য ও তথ্য-প্রযুক্তির জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- টেকসই পর্যটন বিনির্মাণে ও মহামারি সংকট উত্তরণের জন্য কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম, রিভার ট্যুরিজম, হাওড় ট্যুরিজম, গ্রামীণ পর্যটন ও সুনীল পর্যটনে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- পর্যটকদের নিকট পুনরায় আস্থা তৈরি ও নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে রিকভারি প্ল্যান বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- পর্যটন সংশ্লিষ্ট উপখাতগুলোর মধ্যে ট্র্যাভেল এজেন্ট, ট্যুর গাইড, ট্যুর অপারেটর, হোটেল-মোটেল, রিসোর্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ফুড সাপ্লাই চেইন ও অন্যান্য উপখাতসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে পর্যটন উন্নয়নের জন্য গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে ট্যুরিজম ব্যাবসায় ও প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন, যন্ত্রনির্ভরতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ক্লাউড কম্পিউটিং, বিগ ডেটা, রোবটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ও ওয়্যারলেস টেকনোলজি ব্যবহার বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি করতে হবে।
- বর্তমানে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপাদানগুলোর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ওয়েব সাইট, বিগ ডেটা ও কনটেন্ট মার্কেটিংয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় পর্যটন ব্যান্ডিং ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে ইউরোপ,

অস্ট্রেলিয়া, নর্থ আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের দেশগুলো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব) এর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। অতএব উন্নত বিশ্বের ন্যায় পর্যটন প্রমোশনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

- পর্যটনের নতুন ধারণা PPCP (Private-Public-Community Partnership) এর ওপর গুরত্ব আরোপ করতে হবে।
- পর্যটন শিল্পের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রথমত চাহিদা নিরূপণ করা প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী জোগান নিশ্চিত করার জন্য জেলাভিত্তিক সফট স্কিল ট্রেনিং প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পর্যটনকেন্দ্রগুলো চিহ্নিতকরণ, প্রচার ও প্রসারের কাজ গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি করে পর্যটক প্রত্যাশা সম্পর্কে ধারণা সমৃদ্ধ করা দরকার। সেই সাথে ডিজিটাল সেবা ও ডিজিটাল মার্কেটিং কৌশলসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণ ও সন্তুষ্টিবিধান আরও সহজ হবে। ছোটো ছোটো প্রমো তৈরি করে পর্যটনকেন্দ্রগুলোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে প্রজ্বলিত শিখার ন্যায় আলোকিত হবে অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন।

অধ্যায় ৫

পর্যটন নৈতিকতা

Global Code of Ethics for Tourism

পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাব রোধকল্পে ১৯৯৭ সালে ইস্তাম্বুলে জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সাধারণ সভায় নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ৭০টি সদস্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৯৯ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতির টেকসই উন্নয়ন কমিশনের বৈঠকে নীতিমালার ধারণাটি সমর্থিত হয়। সবশেষে, ১লা অক্টোবর ১৯৯৯ সালে চিলির সান্তিয়াগোতে জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সাধারণ সভায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দৃঢ়তার সঙ্গে পর্যটনের অধিকার এবং পর্যটকদের ভ্রমণের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উন্মুক্ত ও উদার আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য ন্যায়সংগত, দায়িত্বপূর্ণ ও টেকসই বিশ্ব পর্যটন আচরণবিধি সংবর্ধিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে এবং এই লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ১০টি ধারা সংবলিত 'পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা' সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে।

অনুচ্ছেদ ১

মানুষ ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং শ্রদ্ধাবোধের ক্ষেত্রে পর্যটনের অবদান

ধারা ১: ধর্মীয়, দার্শনিক এবং নৈতিক বিশ্বাসের বৈচিত্র্যের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধের মনোভাব পোষণ করে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নৈতিক মূল্যবোধ আত্মস্থকরণ

এবং উৎসাহদান হচ্ছে দায়িত্বশীল পর্যটনের ভিত্তি ও ফলাফল। পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই এবং পর্যটকগণ নিজেরাই সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগণসহ সকল জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আচরণবিধি পালন করবে এবং এর গুরুত্ব স্বীকার করবে।

ধারা ২: স্বাগতিক অঞ্চল এবং দেশের আইন, প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও প্রথার প্রেক্ষাপটে তৈরি মর্যাদার প্রতীকাদি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পর্যটন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া উচিত।

ধারা ৩: স্বাগতিক সম্প্রদায় এবং স্থানীয় পেশাজীবীগণ তাদের এলাকায়/দেশে ভ্রমণে আগত পর্যটকগণের সঙ্গে পরিচিত হবেন ও তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং তাদের জীবনযাপনপ্রণালি, রুচি, ভ্রমণে তাদের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় জানতে সচেষ্ট হবেন। পেশাজীবীদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হবে যার দ্বারা পর্যটকগণকে আতিথেয়তাপূর্ণ সম্ভাষণ জানাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ধারা ৪: পর্যটক, ভ্রমণকারী এবং তাদের মালামাল রক্ষা করা স্বাগতিক দেশের সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। অপরিচিত পরিবেশে বিদেশি পর্যটকদের অসহায়তার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে তাদের নিরাপত্তার প্রতি সকল কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকতে হবে। পর্যটকদের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা, বিমা ও সাহায্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রচলন করতে হবে পর্যটক ও পর্যটন শিল্পের কর্মীদের ওপর কোনো ধরনের হামলা, আঘাত, অপহরণ বা ভীতি প্রদর্শন এবং পর্যটন স্থাপনাদি অথবা সাংস্কৃতিক অথবা প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানসমূহের ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন অবশ্যই কঠোরভাবে নিন্দিত এবং স্ব-স্ব দেশের আইন অনুযায়ী দণ্ডিত হবে।

ধারা ৫: ভ্রমণকালে পর্যটক ও ভ্রমণকারীগণ কোনো প্রকার অপরাধমূলক কাজ অথবা ভ্রমণকারী দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী অপরাধ বলে গণ্য হয় এরূপ কোনো কাজ সম্পাদন করবে না এবং স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক অশোভনীয় অথবা ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত কোনো কাজ বা স্থানীয় পরিবেশকে নষ্ট করতে পারে এরূপ কোনো কাজ করা হতে বিরত থাকবেন। তারা অবশ্যই সব ধরনের মাদকদ্রব্য, অস্ত্র, এনটিক্স, সংরক্ষিত প্রজাতি এবং বিপজ্জনক বা নিষিদ্ধ পণ্য বা দ্রব্যাদির অবৈধ ব্যাবসা হতে বিরত থাকবেন।

ধারা ৬: পর্যটক ও ভ্রমণকারীগণ যাত্রার প্রাক্কালেই তারা যেসব দেশ ভ্রমণের জন্য মনোনীত করেছেন সেসব দেশ সম্পর্কে মোটামুটি পরিচিত হয়ে যাওয়া কর্তব্য বলে বিবেচনা করবেন। নিজের পরিচিত পরিবেশের বাইরে ভ্রমণে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে এবং এরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং আচরণ করবেন যাতে এসব ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

অনুচ্ছেদ ২

পর্যটন ব্যক্তিক ও সামষ্টিক পূর্ণতার বাহন

ধারা ১: পর্যটন যার কর্মকাণ্ড সচরাচর অবসর ও বিশ্রাম, খেলাধুলা, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেজন্য এটা পরিকল্পিত এবং ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সম্প্রীতির প্রাধিকার মাধ্যম হিসেবে অনুশীলন করতে হবে, যখন এটা উন্মুক্ত মন নিয়ে অনুশীলন করা হয়, সেক্ষেত্রে পর্যটন স্ব-শিক্ষা, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যকার বৈধ পার্থক্যের ব্যাপারে শিক্ষা লাভের একটি অপ্রতিস্থাপনীয় উপাদান হিসেবে প্রতিভাত হয়।

ধারা ২: পর্যটন কর্মকাণ্ড নারী-পুরুষের সমতার প্রতি সম্মান দেখাবে, এর সকল কর্মকাণ্ড দ্বারা মানবাধিকার সংবর্ধিত করা এবং বিশেষভাবে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল গোষ্ঠী তথা শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জনগণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুরক্ষা করা উচিত।

ধারা ৩: মানুষকে যেকোনো প্রকারে শোষণ, বিশেষ করে যৌন নির্যাতন এবং যা নির্দিষ্ট করে শিশুদের ওপর প্রয়োগ করা হয় তা পর্যটনের মূল লক্ষ্যের পরিপন্থি এবং পর্যটনের অপলাপ। এই কারণে পর্যটনের নামে মানুষকে শোষণ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতায় জোরালোভাবে প্রতিরোধ করা এবং ভ্রমণকৃত দেশ ও যে দেশে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে উভয় দেশের জাতীয় আইনের আওতায়, এমনকি এরূপ রুচিবিকৃত কাজ দেশের বাইরে সংঘটিত হয়ে থাকলেও কোনো প্রকার ছাড় ব্যতিরেকে দণ্ডিত হওয়া উচিত।

ধারা ৪: ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় অথবা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশে ভ্রমণ বিশেষ ধরনের পর্যটনের উপকারী উপাদান যা উৎসাহের দাবি রাখে।

ধারা ৫: শিক্ষা পাঠ্যক্রমে পর্যটক বিনিময়ের উপকারিতা, এই কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুফল এবং ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে এগুলোকে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ৩

পর্যটন উন্নয়নের একটি টেকসই উপাদান

ধারা ১: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সমভাবে পূরণের জন্য নির্ভরযোগ্য, ধারাবাহিক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা করা উচিত।

ধারা ২: পর্যটন শিল্প উন্নয়নে বিরল ও মূল্যবান সম্পদ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে বিশেষ করে পানি ও শক্তির সুষম ব্যবহার, যথাসম্ভব বর্জ্য পরিহার ও এরূপ কর্মকাণ্ডকে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাধিকার এবং উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

ধারা ৩: পর্যটক এবং ভ্রমণকারীদের বেতনসহ ছুটি ও স্কুল ছুটি একই সময়ে না ঘটিয়ে পর্যটনের ধারণক্ষমতার আলোকে আগে-পরে ছুটি বিন্যস্ত ও বিতরণে সমতা রক্ষা করা উচিত। এতে পরিবেশের ওপর পর্যটন কার্যক্রমের চাপ কম এবং পর্যটন শিল্প ও স্থানীয় অর্থনীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ধারা ৪: পর্যটন অবকাঠামো এবং কর্মকাণ্ড এমনভাবে পরিকল্পিত হতে হবে যা ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্যের সমন্বয়ে গঠিত প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে সুরক্ষা বিপন্ন বন্যপ্রাণীর প্রজাতিকে সংরক্ষণে সাহায্য করে। পর্যটন উন্নয়নের পাত্র সংশ্লিষ্ট সকলেই বিশেষত পেশাজীবীগণ স্পর্শকাতর এলাকা যথা মরুভূমি, মেরু অঞ্চল, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল অথবা জলাভূমি, প্রাকৃতিক রিজার্ভ বা সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টিতে লাভজনক এমন এলাকাসমূহে পর্যটন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং সংযম আরোপে একমত হবেন।

ধারা ৫: পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধিকরণ এবং উন্নয়নে প্রকৃতি এবং ইকো-পর্যটন সহায়ক প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও স্থানীয় জনগণ এবং পর্যটন এলাকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪

পর্যটন মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবহারকারী এবং
উৎকর্ষ অর্জনের অংশীদার

ধারা ১: পর্যটন সম্পদ মানবজাতির সাধারণ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত তবে স্ব-স্ব এলাকার জনগোষ্ঠীর পর্যটন সম্পদাদির ওপর তাদের বিশেষ অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব থাকবে।

ধারা ২: পর্যটন নীতিমালা এবং কর্মকাণ্ড শৈল্পিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট ঐতিহ্যগুলো সুরক্ষিত থাকে। স্মৃতিসৌধ, সমাধিমন্দির, তীর্থস্থান, জাদুঘর, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণে এবং উন্নয়নে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে এবং এইগুলো পর্যটকদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। বেসরকারি মালিকানার প্রতি সম্মান সমুন্নত রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সাংস্কৃতিক সম্পদ ও স্মৃতিসৌধ এবং উপাসনার স্বাভাবিক প্রয়োজনের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে ধর্মীয় ভবনাদি জনসাধারণের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

ধারা ৩: সাংস্কৃতিক স্থাপনাদি এবং স্মৃতিসৌধ দর্শনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের ন্যূনতম কিছু অংশ এই সকল ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

ধারা ৪: পর্যটন কর্মকাণ্ড এরূপভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যা ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক দ্রব্যসামগ্রী, শিল্প কৌশল এবং লোক সংস্কৃতি বিলুপ্ত না করে বরং তা টিকিয়ে রাখতে এবং সমৃদ্ধি অর্জনে ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৫

পর্যটন স্বাগতিক দেশ ও সম্প্রদায়ের জন্য একটি কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড

ধারা ১: পর্যটন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা উচিত এবং এরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সৃষ্ট চাকুরিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধাদিতে তাদের ন্যায়সংগত অংশীদারিত্ব থাকা উচিত।

ধারা ২: পর্যটন নীতিমালার প্রয়োগ এরূপ হওয়া উচিত যার ফলে ভ্রমণকৃত অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং তাদের চাহিদা পূরণ হয়। উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিকল্পনা, স্থাপত্য কৌশল নির্বাচন, পর্যটন স্থাপনা পরিচালনা এবং আবাসনের বিষয়গুলো অঙ্গীভূত করা সমদক্ষতার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনশক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ধারা ৩: সনাতন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ্রাস পাওয়ার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, দ্বীপাঞ্চল এবং সংবেদনশীল গ্রামীণ বা পার্বত্য অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে বিরল সুযোগ থাকায় এসব স্থানে সুনির্দিষ্ট অসুবিধাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ধারা ৪: পর্যটন সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীগণ, বিশেষ করে বিনিয়োগকারীগণের সরকারি বিধিমালার আওতায় পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির ওপর তাদের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পাদি কী ধরনের প্রভাব ফেলে তার সমীক্ষা চালানো উচিত তারা সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এবং এর পূর্বপরিজের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করবে এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের সঙ্গে তাদের কর্মসূচির ব্যাপারে আলোচনাকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৬

পর্যটন উন্নয়নে অংশীদারগণের দায়-দায়িত্ব

ধারা ১: পর্যটন পেশাজীবীদের দায়িত্ব হলো পর্যটকদেরকে তাদের গন্তব্যস্থান, ভ্রমণের শর্তাবলি, আতিথেয়তা এবং অবস্থান সম্পর্কে বাস্তব এবং সঠিক তথ্য প্রদান, তাদের গ্রাহকদের সাথে চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রদেয় সেবার মান, মূল্য ও প্রকৃতি অথবা একতরফাভাবে চুক্তি ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ বিষয়ে উভয় পক্ষের নিকট সহজবোধ্য হয়, এ সকল বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা ২: পর্যটন পেশাজীবীগণ যেহেতু পর্যটন শিল্পের ওপরই নির্ভরশীল, সেহেতু যারা সেবা গ্রহণে আগ্রহী সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান এবং খাদ্য নিরাপত্তার সচেতনতা দেখাবেন। অনুরূপভাবে তারা বিমা এবং সাহায্য ব্যবস্থার উপযুক্ত পদ্ধতি বলবৎ রাখার নিশ্চয়তা বিধান করবেন, তারা রাষ্ট্রীয় আইনের নির্ধারিত নিয়মে অভিযোগের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করবেন এবং সম্পাদিত চুক্তির দায়-দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দেবেন।

ধারা ৩: পর্যটন পেশাজীবীগণ, তাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব সে অনুযায়ী পর্যটকদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় চাহিদা পূরণে অবদান রাখবেন এবং পর্যটকদের ধর্ম পালনে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ধারা ৪: উৎস এবং স্বাগতিক দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ পর্যটন পেশাজীবী ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানাদির সহযোগিতার এরূপ প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া বলবৎ রাখা নিশ্চিত করবে যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে তাদের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত ভ্রমণকারী পর্যটকদের দেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়।

ধারা ৫: সরকারের, বিশেষ করে সংকটকালে, অধিকার এবং কর্তব্য হলো যে, দেশের জনগণকে বিদেশ ভ্রমণের অনুষঙ্গ হিসেবে কঠিন সমস্যায় বা বিপদে পড়ার

বিষয়টি অবহিত করা, অন্যায্যতা ও অতিরঞ্জন পরিহার করে স্বাগতিক দেশের পর্যটনশিল্প এবং এর পর্যটক পেশাজীবীবর্গ ভ্রমণ উপদেশাবলি বিষয়ে স্বাগতিক দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্বালোচনার মাধ্যমে ভ্রমণের অসুবিধা ও বিপদ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার কর্তৃক ভ্রমণ বিষয়ক উপদেশাবলি জারির পূর্বে তার পর্যটন পেশাজীবী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যে ভৌগোলিক এলাকায় নিরাপত্তাহীনতার উদ্ভব ঘটেছে এবং যে ধরনের বিপদের আশঙ্কা আছে শুধুমাত্র তার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক উপদেশাবলি তৈরি করতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পরপরই এরূপ উপদেশাবলি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

ধারা ৬: সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে ভ্রমণ সংক্রান্ত সংবাদমাধ্যম এবং অন্যান্য আধুনিক ইলেকট্রনিক যোগাযোগমাধ্যমসমূহের বিভিন্ন ঘটনা এবং পরিস্থিতি যা পর্যটক প্রবাহকে প্রভাবিত করে এরূপ ঘটনা সম্পর্কে সঠিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য প্রদান করা উচিত। তাদের পর্যটন সেবা গ্রহীতাদেরকে সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান করা উচিত। পর্যটন তথ্য প্রবাহে নতুন যোগাযোগব্যবস্থা এবং ই-কমার্স ব্যবহার করা এবং এর উন্নতিসাধন করা উচিত। প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে কোনোভাবে যৌনতা নির্ভর পর্যটনকে উৎসাহ বা সহায়তা দেওয়া উচিত হবে না।

অনুচ্ছেদ ৭

পর্যটনের অধিকার

ধারা ১: পৃথিবীর সকল জনগণের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত, সরাসরি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই গ্রহের সম্পদাদির আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করা এবং আনন্দলাভের সুযোগ একটি আইনগত অধিকার। অবসর সময়ের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটনে অংশগ্রহণ সর্বোত্তম প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং এর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

ধারা ২: অবসর ও বিশ্রামের অধিকার পর্যটনের সর্বজনীন অধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে। 'দি ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস'-এর আর্টিকেল ২৪ এবং 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্যান্ট অব ইকোনমিক', সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস-এর আর্টিকেল ৭ডি মোতাবেক সীমারেখার মধ্যে কাজের সময় এবং পর্যবৃত্ত বৈতনিক ছুটি অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার থাকতে হবে।

ধারা ৩: সরকারি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সামাজিক পর্যটন বিশেষ করে সম্মিলিত পর্যটন যা অবসর ভ্রমণ এবং ছুটির দিনের পর্যটনকে বিপুলভাবে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

ধারা ৪: পারিবারিক, যুব, ছাত্র ও প্রবীণ পর্যটন এবং প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়া এবং সহজ করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ৮

পর্যটকদের চলাচলের স্বাধীনতা

ধারা ১: 'দি ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস'-এর অনুচ্ছে ১৩ অনুসারে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের ধারাসমূহ মেনে নিয়ে পর্যটক এবং ভ্রমণকারীগণের নিজ নিজ দেশের ভূখণ্ডের মধ্যে এবং এক রাষ্ট্র হতে অন্য রাষ্ট্রে চলাচলের সুবিধা পাওয়া উচিত, অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা বা কোনো প্রকারের বৈষম্য না করে পর্যটকগণকে ট্রানজিট এবং থাকার জায়গা দেওয়া এবাং পর্যটনে ও সাংস্কৃতিক স্থানসমূহে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

ধারা ২: পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের সকল ধরনের যোগাযোগব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ অথবা বহির্গমনের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত, পর্যটকগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, আইন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এর সাহায্য ও সেবা দ্রুত ও সহজে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উপকার, বলবৎ কূটনৈতিক সমঝোতার ব্যবস্থার অধীনে পর্যটকগণের তাদের স্ব-স্ব দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যেকোনো সময় যোগাযোগ বাধাহীন হওয়া উচিত।

ধারা ৩: স্বাগতিক দেশের নাগরিকগণ ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণে গোপনীয়তার যে অধিকার ভোগ করে, অনুরূপভাবে একই অধিকারের সুযোগ পর্যটক এবং ভ্রমণকারীদের পাওয়া উচিত, বিশেষ করে এ সকল তথ্য যখন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

ধারা ৪: রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে প্রণীত সীমান্ত অতিক্রমের প্রশাসনিক পদ্ধতি যেমন– ভিসা বা স্বাস্থ্য এবং কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতাসমূহ যতদূর সম্ভব ততটুকু সংগতিপূর্ণ করতে হবে যাতে ভ্রমণের সর্বোত্তম স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত রাখতে সহায়ক হয়, ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত দেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এ সকল পদ্ধতি সংগতিপূর্ণ এবং সহজীকরণে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। পর্যটন শিল্পকে দণ্ডিত বা এর

প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দুর্বল না করার জন্য আরোপিত নির্দিষ্ট খাজনা ও করসমূহ পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত বা সংশোধন করা উচিত।

ধারা ৫: দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে পর্যটকগণ তাদের ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ প্রাপ্তির সুযোগ থাকা উচিত।

অনুচ্ছেদ ৯

পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত কর্মী এবং সংগঠকগণের অধিকার

ধারা ১: জাতীয় এবং স্থানীয় প্রশাসনসমূহের তত্ত্বধানে পর্যটন শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে কর্মরত বেতনভুক্ত এবং স্ব-নিয়োজিত কর্মীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা উচিত পর্যটন কর্মীদের মৌসুমভিত্তিক কর্মকাণ্ড, তাদের বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্তি এবং কাজের প্রকৃতির কারণে তাদের প্রায়শ খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ ধরনের কর্ম পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাসমূহের উৎস এবং স্বাগতিক দেশ বিশেষ যত্নসহকারে বিবেচনা করবে।

ধারা ২: পর্যটনশিল্পে কর্মরত বেতনভুক্ত এবং স্ব-নিয়োজিত কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রাথমিক এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ অর্জনের অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে যথেষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া, চাকুরির অনিশ্চয়তা যতদূর সম্ভব দূর করা এবং এই খাতের মৌসুমি কর্মীদের, বিশেষ করে সামাজিক কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় এনে সুনির্দিষ্ট পদমর্যাদা দেওয়া উচিত।

ধারা ৩: বিদ্যমান জাতীয় আইনের আওতায় বা জন্মসূত্রে বৈধ নাগরিক, যদি তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকে, তবে তার পর্যটনখাতে পেশাজীবী কর্মকাণ্ড উন্নয়নের অধিকারপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীগণের বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাত্রার উদ্যোগের ক্ষেত্রে, ন্যূনতম আইনগত ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ভেতর পর্যটন বিনিয়োগের উন্মুক্ত অধিকার থাকা উচিত।

ধারা ৪: বিভিন্ন দেশের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রমিক, তারা বেতনভুক্ত হোক বা না হোক, তাদেরকে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ প্রদানে বিশ্ব পর্যটকশিল্প পৃষ্ঠপোষকতার অবদান রাখে। প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং জাতীয় আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক যতটুকু সম্ভব এ সকল যোগাযোগ সহজতর করা উচিত।

ধারা ৫: আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির একটি অদ্বিতীয় উপাদান সৌহার্দ রক্ষার লক্ষ্যে পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত বহুজাতিক

সংস্থাগুলো এই শিল্পে তাদের প্রভাবশালী অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করবে না। তারা স্বাগতিক দেশে মূলধন বিনিয়োগ ও বাণিজ্য করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের বিনিময়ে স্বাগতিক সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শের কৃত্রিম বাহক হওয়া এড়িয়ে যাবেন। তারা স্থানীয় উন্নয়নে ব্রতী হবেন এবং অতিরিক্ত মুনাফা প্রত্যাবাসন এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি যা যে দেশে তারা প্রতিষ্ঠিত সেই দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান ক্ষুণ্ন করে এরূপ অবস্থা পরিহার করবেন।

ধারা ৬: উৎস এবং গ্রহীতা দেশের প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষাকারী টেকসই পর্যটন উন্নয়নে এবং এর ফলস্বরূপ প্রাপ্য সুবিধাদি বিতরণের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

অনুচ্ছেদ ১০

পর্যটনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণ বিধিমালা বাস্তবায়ন

ধারা ১: পর্যটন উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারগণের এই সকল আচরণ বিধিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা এবং এর ফলপ্রসূ প্রয়োগ পরিবীক্ষণ করা উচিত।

ধারা ২: পর্যটন উন্নয়নের অংশীদারগণকে আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ বিধিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থানকারী বিশ্ব পর্যটন সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা যারা পর্যটন উন্নয়ন ও প্রচারে মানবাধিকার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখছে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

ধারা ৩: পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা প্রয়োগ অথবা ব্যাখ্যার বিষয়ে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য একটি নিরপেক্ষ সংগঠন যা ওয়ার্ল্ড কমিটি অন ট্যুরিজম এথিক্স নামে পরিচিত এর বরাবর উপস্থাপনের জন্য পর্যটন উন্নয়নের অংশীদারগণকে আগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে।

অধ্যায় ৬

পর্যটনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারগণ এবং তাদের দায়িত্ব

National & International Stakeholders and their Responsibilities in Tourism

পর্যটন শিল্পের স্টেকহোল্ডার বলতে পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বার্থযুক্ত কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যারা টেকসই পর্যটন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত থাকে। স্টেকহোল্ডারদের সংখ্যা গন্তব্যের ধরনের ওপর নির্ভর করে। পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, বন, নদী, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির সাথে সম্পৃক্ত অধিদপ্তর বা বিভাগ ইত্যাদি বাংলাদেশের পর্যটনের সরকারি স্টেকহোল্ডারের অন্যতম উদাহরণ। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের স্টেকহোল্ডার।

বাংলাদেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো–

জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারস

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের বেসামরিক বিমান

পরিবহণ খাতের উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং দেশীয় পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশে নীতি নির্ধারণ ও সহযোগিতা করা।

অধীনস্থ বিভাগ

- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড
- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
- বাংলাদেশ বিমান
- হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
- বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত বিষয়গুলো তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিমান পরিবহণ বিভাগ সৃষ্টি করে ওই বিভাগকে জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয় কিন্তু ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে পুনরায় এ মন্ত্রণালয়কে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে রূপান্তর করা হয়। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ পুনরায় বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অবলুপ্তি ঘটে এবং এটিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগে পরিণত করা হয়। ১৯৮৬ সালে সরকারি আদেশ অনুসারে (নং সিডি-৪-৫২-৮৪-বুলস, তারিখ জুলাই ৮, ১৯৮৬) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পুনরায় একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভিশন

বাংলাদেশকে একটি অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণ।

মিশন

নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

চিরায়ত বাংলার অনিন্দ্য রূপ ও সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে পর্যটন খাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করা এবং বিমান পরিবহণ সংস্থাকে আধুনিকায়ন করা ও গ্রাহকসেবা প্রদান ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভীলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে–

- এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা
- পর্যটন খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা
- পর্যটন শিল্পকে সবচেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে গড়ে তোলা
- বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহকে বিশ্বব্যাপী প্রচার এবং একে বিশ্বদরবারে একটি পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং করা।
- প্রতিযোগিতামূলক এভিয়েশন বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য বিমানকে দক্ষ, গতিশীল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা
- একটি উন্নততর ও সমৃদ্ধ দেশ, সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (BTC)

পাকিস্তান পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড বিলুপ্ত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৪৩ ধারা বলে দেশের প্রথম সরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' যাত্রা শুরু করে।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ১ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে একটি কর্পোরেট বডি হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠন করা হয়। সরকার পরিশোধিত মূলধন সরবরাহ করে।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন পর্যটন আবাসন স্থাপনে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। নতুন ও অপরিচিত স্থানে হোটেল তৈরি করার জন্য তারা লোকসান

গুনেছে বছরের পর বছর। পরবর্তীতে সেখানে ধীরে ধীরে পর্যটক যেতে শুরু করেছে এবং অনেক বেসরকারি উদ্যোক্তারাও গিয়ে হোটেল নির্মাণ করেছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের এই পদক্ষেপ পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (BTB)

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠন করা হয় একদিকে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যদিকে জাতীয় পর্যটন প্রতিষ্ঠান হিসেবে। কিন্তু সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে আরেকটি 'জাতীয় পর্যটন প্রতিষ্ঠান' হিসেবে ২০১০ সালে বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড গঠন করা হয়।

পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও গণসচেতনতা তৈরি। পর্যটন আকর্ষণের মাননিয়ন্ত্রণ এবং পর্যটকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় মানসম্পন্ন পর্যটন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। পর্যটন সম্পর্কিত যাবতীয় মেলার আয়োজন, প্রচার ও প্রকাশনামূলক কার্যক্রম গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদান। বিদেশি পর্যটন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের পর্যটন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান ও কাজে সমন্বয় সাধন। পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাসমূহ সৃষ্টি, পর্যটন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, দেশে-বিদেশে বিপণনের বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ বা দপ্তরের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়সাধন। বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন এবং অবস্থানকে সহজতর ও নিরাপদ করাসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন। পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা প্রদান, পর্যটন উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, সুপারিশ প্রদান ও বিদ্যমান পর্যটন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা, দায়িত্বশীল পর্যটন (Responsible Tourism) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকার, ব্যক্তিখাত, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, নারী সংগঠন ও মিডিয়ার অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য গবেষণা, আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO)

এটি জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশসহ ১৫৮টি দেশ এর সদস্য। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের

মধ্য থেকে রয়েছে ৫০০ ও বেশি অ্যাফিলিয়েটেড সদস্য। এই প্রতিষ্ঠান পর্যটনের বাজার, প্রতিযোগিতা ও নীতি-নির্ধারণী কাজ করে থাকে। পর্যটনের সংজ্ঞা, বিশ্ব পর্যটন দিবস, বিশ্বব্যাপী পালনীয় পর্যটনের নৈতিকতাসহ প্রচুর মৌলিক বিষয় তৈরি করেছে এই প্রতিষ্ঠান। স্পেনের মাদ্রিদে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল (WTTC)

৮০'র দশকে স্থাপিত একটি বেসরকারি ট্যুরিজম ফোরাম। লন্ডনে এদের সদর দপ্তর। এরা পর্যটনের ওপর গবেষণা করার জন্য পৃথিবীব্যাপী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। অর্থনীতিতে পর্যটনের প্রভাব নির্ণয় শীর্ষক গবেষণার জন্য এরা বিশ্বখ্যাত।

AMFORHT (World Association for Hospitality and Tourism Education and Training)

AMFORHT হলো জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC) এর অংশীদারিত্বে একটি বেসরকারি সংস্থা, যা ১৯৬৯ সালে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (UNWTO) উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। ফ্রান্সের Telesack শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। AMFORHT হসপিটালিটি, রন্ধনশিল্প এবং পর্যটন শিল্পে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার সমস্ত মূল অংশীদারদের জন্য বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে পর্যটন এবং আতিথেয়তা শিল্পের সেবা করে।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন (Pacific Asia Travel Association-PATA)

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন (PATA) একটি অলাভজনক সংস্থা যা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে এবং এর মধ্যে ভ্রমণ এবং পর্যটনের দায়িত্বশীল বিকাশের জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। অ্যাসোসিয়েশন তার সদস্য সংস্থাগুলোকে সমন্বিত অ্যাডভোকেসি, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণা এবং উদ্ভাবনী ঘটনা সরবরাহ করে, যার মধ্যে ৯৫টি সরকারি, রাজ্য এবং শহরের পর্যটন সংস্থা, ২৯টি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা, বিমানবন্দর এবং ক্রুজ লাইন, ৬৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এশিয়া প্যাসিফিক এবং এর বাইরেও শত শত ভ্রমণ শিল্প কোম্পানি রয়েছে।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দায়িত্বশীল পর্যটনের প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন। সংক্ষেপে একে পাটা বলে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৫১ সালে এটি তৈরি হয়। বেইজিং ও লন্ডনে এর সদর দপ্তর।

ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (IATA)

১৯৪৫ সালের ১৯ এপ্রিল কিউবাতে এটি তৈরি হয়। ২৯৫টি এয়ারলাইন্স এর সদস্য। এর সদস্যরা মোট এয়ার প্যাসেঞ্জারদের ৮২% যাত্রী বহন করে। কানাডার মন্ট্রিলে এদের সদর দপ্তর অবস্থিত।

JATA (Japan Associations of Travel Agents)

ট্রাভেল এজেন্সি আইনের ওপর ভিত্তি করে জাপান ট্যুরিজম এজেন্সির কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত একটি অ্যাসোসিয়েশন, জাপান অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস (JATA) জাপানে এবং সেখান থেকে ভ্রমণকারীদের প্রদত্ত পরিষেবার মান উন্নত করতে চায়। এটি তথ্য প্রচার সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং ব্যাবসা ও আইনের উন্নয়নের প্রচারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশে অবদান রাখে যা সদস্যপদ এবং শিল্পকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে।

জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণ ছাড়াও বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সাথে বিভিন্ন সংগঠন জড়িত আছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু সংগঠনের বর্ণনা দেওয়া হলো–

Association of Travel Agents of Baangladesh (ATAB)

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ট্রাভেল এজেন্সির মালিকরা তাদের ব্যাবসায়িক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি সদ্য জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের ভ্রমণ ও পর্যটন/এভিয়েশন শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এক ছাতার নিচে একত্র হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎকালীন সময়ের ট্রাভেল এজেন্সির মালিকরা ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা ক্লাবে একত্র হন এবং 'আইএটিএ ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএএ)' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। নবগঠিত সমিতিকে তখন সরকারের কাছে নিবন্ধিত হতে হয়।

বর্তমান ATAB অফিসটি ১৭ জুন ২০০৭ সালে সাত্তারা সেন্টার, নয়া পল্টন, ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ATAB এর সিলেট জোনাল অফিস ২০০৬ সালে এবং চট্টগ্রাম অফিস ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করে। ATAB ২০০৭ সালে ATAB

ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ATTI) প্রতিষ্ঠা করে যা ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের জন্য দক্ষতার সাথে কাজ করে। ইতোমধ্যে প্রায় ২৫০০ প্রশিক্ষণার্থী ATTI দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে যারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছে এবং এইভাবে ATAB দেশে দক্ষ কর্মী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আজ ATAB প্রায় ৩৫০০ সদস্যসহ দেশের সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিচিত সমিতিগুলোর মধ্যে একটি। ATAB-কে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ের মধ্যে ATAB বিমান চলাচল ও পর্যটন খাতে একটি শক্তিশালী স্টেকহোল্ডার হয়ে উঠেছে।

Tour Operator Association Of Bangladsh (TOAB)

১৯৯২ সালে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) গঠিত হয়েছিল। এটি এমন সময় ছিল যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্যুর পরিচালনাকারী মুষ্টিমেয় কয়েকটি এজেন্সি, তাদের মুখোমুখি হওয়া বিশাল সমস্যা এবং অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে এই জাতীয় সংস্থা বা বাণিজ্য সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। সংস্থাটির অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের পর্যটনের বিকাশ ও পুষ্টি এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের পর্যটন পণ্যের প্রচার করা। দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর, অ্যাসোসিয়েশনটি ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি বাণিজ্য সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে TOAB-এর ৭৫১ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে।

Tourism Resort Industries Association of Bangladesh (TRIAB)

ট্রিয়াব হলো রিসোর্ট মালিকদের একটি সংগঠন। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে রিসোর্টের অবদান রয়েছে। এ সংগঠনটি পর্যটন এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

Bangladesh International Hotel Association (BIHA)

এটি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনটি ৫১টিরও বেশি আন্তর্জাতিক হোটেলের প্রতিনিধিত্ব করে। বিহা বাংলাদেশের হোটেল এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

পর্যটকদের সুরক্ষায় স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব

পর্যটন স্টেকহোল্ডারগণ এই শিল্পের উন্নয়ন, পরিচালনা ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অবস্থা সৃষ্টি করে। অবস্থা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে যেকোনো একটি উৎস ও

গন্তব্যে (Origin and Destination) কত স্টেকহোল্ডার থাকবেন। আবার পর্যটন শিল্পে সকল মিলে সমান দায়িত্ব পালন কারতে পারেন না। তবে প্রত্যেকের দায়িত্বই গুরুত্বপূর্ণ। স্টেকহোল্ডারদের যত দায়িত্ব আছে তার মধ্যে পর্যটকদের সুরক্ষা প্রদান করা অন্যতম। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, মোট ৫ ধরনের স্টেকহোল্ডার পর্যটন শিল্পে দৃশ্যমান। নিচে এদের নিয়ে আলোচনা করা হলো–

পর্যটন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান

পর্যটনের শিক্ষক, গবেষক ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণ এই শ্রেণিভুক্ত। এরা পর্যটনের প্রতিদিনকার সুবিধা-অসুবিধা দূর করার জন্য কিংবা উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে এসব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের গবেষণার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে পর্যটকদের নিরাপত্তা বিষয়টি সবসময়ই বিশেষভাবে স্থান পাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হলো ওই এলাকায় বসবাসরত গণমানুষসহ আগত পর্যটকদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কেননা প্রত্যেকটি গন্তব্যই কোনো না কোনো স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক এলাকার আওতাভুক্ত।

সরকারি প্রতিষ্ঠান

পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের দায়িত্ব পালন করে, এদের মধ্যে নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। তাই পর্যটন গন্তব্য ও পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান করার প্রধান দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের।

বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠান

লাভজনক এবং উন্নয়নমুখী নানা ধরনের পর্যটন প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এরা পর্যটন শিল্পের বহুমুখী দিক নিয়ে কাজ করে বিধায় উন্নয়ন ও নিরাপত্তা একই সূত্রে গাঁথা থাকে। কারণ পর্যটকদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে না পারলে এই শিল্পের অগ্রগতি সম্ভবপর হবে না।

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি ও বেসরকারি হতে পারে। আবার এরা পণ্য ও সেবা উভয়ই সরবরাহ করতে পারে। পর্যটন শিল্পে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় ধরনের সেবাপণ্যেরই প্রয়োজন পড়ে। পর্যটনে ওই সকল সেবাপণ্য একটি গন্তব্য পর্যটকদের

আসার জন্য এবং আসার পর ক্রয় করে ভোগ করতে হয়। তাই পর্যটকদের জন্য নির্ভয় গন্তব্য গড়ে তুলতে না পারলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্য করতে পারবে না। এই বিবেচনার তাদের নিজস্ব আঙ্গিকে তারাও সাধ্যমতো নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলে। আবার স্টেকহোল্ডারদেরকে উৎস ও গন্তব্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

পর্যটন উৎসের (Place/Country of Origin) স্টেকহোল্ডার

তথ্য সরবরাহকারী ও মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান

যে উৎস স্থান থেকে পর্যটকরা গন্তব্যকে বেছে নেন, সেখানে তথ্য সরবরাহকারী ও মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান থাকে। যাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এবং সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পর্যটকরা তাদের পছন্দ মতো গন্তব্যে গমন করেন। এদের উচিত পর্যটকদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য তথ্যের সাথে আবহাওয়া ও নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যাবলি সরবরাহ করা। কেননা এই সকল তথ্যের ঘাটতি থাকলে পর্যটকরা অকারণে সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

উৎস থেকে গন্তব্যে এবং গন্তব্য থেকে উৎসে পরিবহণ পরিচালনা প্রতিষ্ঠান

গন্তব্যে পৌঁছানোর ও ফেরার পরিবহণ যারা পরিচালনা করেন (যেমন বিমান, রেল, সড়ক ও নৌযান) তাদেরও উচিত পর্যটকদেরকে যানবাহন পরিচালনাকালীন সকল তথ্য বিশেষত নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যাবলি যথাযথভাবে সরবরাহ করা। যানচলাচলকালীন সংকট ও গন্তব্যের সামসময়িক সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে সবিস্তারে সকল তথ্য সরবরাহ করা উচিত। এই জাতীয় তথ্য পর্যটকদেরকে নানান দিক থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।

পর্যটন গন্তব্যের (Destination) প্রত্যক্ষ স্টেকহোল্ডার

সরবরাহ শিকল

আবাসন, খাদ্য, গন্তব্যের পরিবহণ এবং বিনোদন ও অন্যান্য ইত্যাদি হলো একটি গন্তব্যের সরবরাহ শিকলের প্রধান সদস্য। পর্যটকরা কোনো গন্তব্যে গমন করার পর সেবা উৎপাদনকারী হিসেবে এ সকল সদস্যরা পর্যটকদের ঘনিষ্ট অবস্থানে থাকে। ফলে গুণগত সেবাপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাথমিক সুরক্ষার জন্য এরাই দায়ী। সকল ধরনের সেবা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে উৎপাদন না করতে পারলে তা পর্যটকদের

জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। এ বিষয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

মধ্যস্থতাকারী

ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর ব্রোকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পর্যটন শিল্পের প্রধান মধ্যস্থতাকারী। এরা Single Point Service Delivery করে। ট্যুর অপারেটররা বাজার থেকে পাইকারি মূল্যে পর্যটন সেবাসমূহ ক্রয় করে এবং পর্যটকদের চাহিদা ও পছন্দ মতো প্যাকেজ তৈরি করে তা নিজে কিংবা ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে খুচরা মূল্যে বিক্রয় করে। তাই পর্যটন শিল্পের অন্যতম স্টেকহোল্ডার হিসেবে পর্যটকদের সুরক্ষার দায়িত্বের অনেকটাই বর্তায় ট্যুর অপারেটরদের ওপর। ট্যুর অপারেটর প্রয়োজনে ট্যুরিস্ট পুলিশের নিকট প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা চাইতে পারে।

গ্রাউন্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

FIT ট্যুরিস্ট বা অনেক সময় GIT ট্যুরিস্টরাও প্যাকেজ ট্যুরের আওতায় না এসে Walk in customer হিসেবে একটি গন্তব্যে এসে হাজির হন। তখন গ্রাউন্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন যানবাহন, গাইড, আবাসন ইত্যাদি)তাদের সেবাসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান

পর্যটকদের বিনোদনের জন্য স্থানীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে নানা ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়। এগুলো পর্যটকদের Night Life-এর অংশ এবং পর্যটন গন্তব্যের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে পরিগণিত। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জনগোষ্ঠী আগত পর্যটকদের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়। ফলে উভয় পক্ষই একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারে। এরূপ জানাশোনা এক ধরনের পরোক্ষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলে।

ট্যুরিস্ট গাইড

পর্যটকরা কোনো গন্তব্যের আকর্ষণসমূহ যথাযথভাবে দর্শনের জন্য ট্যুরিস্ট গাইডের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। একজন গাইড ট্যুর অপারেটর কিংবা পর্যটক দ্বারা নিয়োজিত হয়ে ভ্রমণসূচির চাহিদা মোতাবেক দর্শনীয় স্থানসমূহ ব্যাখ্যাসহ দেখানোর চেষ্টা করেন। ট্যুরিস্ট গাইডের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড আছে (যেমন হলুদ ব্যাজ, সবুজ ব্যাজ, নীল ব্যাজ) ।যদিও আমাদের দেশে এখনো তা নির্ধারণ করা শুরু

হয়নি। ট্যুরিস্ট গাইডরা স্থানীয় হয় বিধায় নিরাপত্তা ইস্যুতে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যটন গন্তব্যের (Destination) পরোক্ষ স্টেকহোল্ডার

স্থানীয় ও স্বাগত জনগোষ্ঠী

আমাদের মতো দেশে কমিউনিটি ভিত্তিক ও দারিদ্র্যবান্ধব পর্যটন বাস্তবায়ন করতে হবে। এই ধরনের পর্যটন দারিদ্র্য মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে একটি স্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করতে পারে। ফলে পর্যটকরা এমনিতেই সুরক্ষা চাদরে ঢাকা পড়ে যাবেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে একটি গন্তব্যে ট্যুরিস্ট পুলিশের ভূমিকা অপরিসীম। পর্যটনকে জনকল্যাণমুখী শান্তির শিল্প হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সাধারণ রীতি-নীতির মতো পর্যটন শিল্পে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ২০১০-এর সেকশন ৬.৯-এ পর্যটন নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠিত হয়। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষাসহ নিরাপদ পর্যটন গন্তব্য গঠনে ট্যুরিস্ট পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। এ বইয়ের ৮ম অধ্যায়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

পরোক্ষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান

স্ট্রিট ফুড বিক্রেতা, হকার, দোকানদার ইত্যাদি পরোক্ষভাবে পর্যটন সেবাদান করে থাকেন। ফলে পর্যটন শিল্পে এরা দূরবর্তী স্টেকহোল্ডার। এদের পরোক্ষ অবদান আছে পর্যটনে। নিরাপত্তা ইস্যুতে এরা পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

অধ্যায় ৭

পর্যটন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি

Tourism related Acts & Regulations

পৃথিবীর যে সকল দেশে পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেখানে তৈরি হয়েছে প্রয়োজনীয় আইন। বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যটন সংশ্লিষ্ট যে কয়টি আইন রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো–

- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭২
- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
- বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭
- বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০
- বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০
- বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
- বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪
- বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন আইন, ২০১৪

এছাড়া ইমিগ্রেশন অধ্যাদেশ ১৯৮২, ট্যুরিস্ট ব্যাগেজ (আমদানি) রুল ১৯৮১, কাস্টমস আইন ২০১৪, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭ ইত্যাদি ইনবাউন্ড ও আউটবাউন্ড পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পর্যটকদের গমনাগমনের জন্য এই সকল আইন প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আবার অভ্যন্তরীণ পর্যটন পরিচালনার ক্ষেত্রে বন ও পরিবেশ বিষয়ক ৩টি (তিন) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

এগুলো হলো বন আইন ২০০০, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২। অধিকন্তু পর্যটন ব্যাবসা পরিচালনা করার জন্য কোম্পানি আইন ১৯৯৪, চুক্তি আইন ১৮৭২, অংশীদারিত্ব আইন ১৯৩২ প্রভৃতিরও বিশেষ ব্যবহার রয়েছে।

পর্যটন বিষয়ক আইনের পাশাপাশি কিছু নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। যেমন জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০, জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ ইত্যাদি। এই সকল নীতিমালায় বাংলাদেশের পর্যটন বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০-এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানব পুঁজির উন্নয়ন ও সমাহার ঘটিয়ে দেশের সব ধরনের শিল্পখাত ও পর্যটন শিল্পসহ উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সরকার সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ ও দক্ষতার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও খাতের বিভিন্ন ব্যাংকিং ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা হবে। এই নীতিতে মোট ৩২টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প (Thrust Sector) খাতের মধ্যে পর্যটনশিল্পকে পঞ্চম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আইন

ওপরে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো আইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাদের মধ্যে নিচের আইনগুলো সম্বন্ধে খানিকটা বিস্তারিত জানা দরকার। তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এটি আইনকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো–

বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প ও সেবাখাতের পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল ঘোষণা এবং পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকায় অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকল্পে ৩০ জুন ২০১০ তারিখে এই আইন জারি করা হয়। এই আইনে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চলকে কীভাবে গড়ে তোলা যায় এবং সংরক্ষণ করা যায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

- পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা পর্যটন শিল্প রয়েছে কিংবা পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে এমন কোনো এলাকাকে সরকার পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে

- বিশেষ পর্যটন অঞ্চল: সরকার পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় বিশেষ পর্যটন অঞ্চল তৈরি করতে পারবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়নকল্পে দেশি-বিদেশি এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে সরকার বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে বলে এই আইনে উল্লেখ করা হয়

বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সিজ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ রহিত করে ২৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে এই আইনটি পুনঃপ্রণয়ন করা হয়।

এই আইনে বলা হয় যে, নিবন্ধন ব্যতীত কোনো ট্রাভেল এজেন্সি তার কোনো প্রকার সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। নিবন্ধন সনদ লাভের জন্য ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সনদ, ব্যাবসায়িক ঠিকানা, সেবা প্রদানের নামে প্রতারণা করা হবে না মর্মে হলফনামা এবং লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন ও সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন প্রভৃতি দলিলাদিসহ আবেদন করতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিক নন এবং অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সের নিচে এমন কেউ ট্রাভেল এজেন্সি স্থাপন করতে পারবেন না। প্রাথমিকভাবে ৩ বছরের জন্য নতুন ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধনপ্রাপ্ত হবে যা পরে নির্ধারিত ফি প্রদান করে এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নবায়ন করা যাবে। এই নিবন্ধন পর্যটনের নামে বাংলাদেশে অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষের গমনাগমনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী) আদেশ ১৯৭২, বাংলাদেশ পাসপোর্ট আদেশ ১৯৭৩, দ্য ইমিগ্রেশন অধ্যাদেশ ১৯৮২, দ্য ইমিগ্রেশন রুলস ২০০২, দ্য ফরেনার্স ১৯৪৬ ইত্যাদি আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে।

সনদ হস্তান্তরযোগ্য নয় : আইন অনুযায়ী নির্ধারিত শর্ত ভঙ্গ করলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় এই নিবন্ধ স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার রাখে। কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধান পালন না করলে তার জন্য অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড এবং অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪

বাংলাদেশ হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ অধ্যাদেশ ১৯৮৬-এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে তা পরিমার্জনপূর্বক এই আইন প্রণয়ন করে। ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে জারি করা হলো। এই আইনে হোটেল এবং রেস্তোরাঁকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে–

- হোটেল: অন্যূন ১০ শয়নকক্ষবিশিষ্ট কোনো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেখানে অর্থের বিনিময়ে অতিথিদের জন্য আবাসন, খাদ্য বা আবাসন ও খাদ্যসহ অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং গেস্ট হাউজ, মোটেল, রিসোর্ট, রেস্ট হাউজ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
- রেস্তোরাঁ: রেস্তোরাঁ এমন একটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে অর্থের বিনিময়ে ৩০ জন বা তদূর্ধ্ব ক্রেতা আসন গ্রহণপূর্বক মানসম্মত খাদ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে। এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি হোটেল বা রেস্তোরাঁ পরিচালনা করতে পারবেন না। নিচের শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে হোটেলের নিবন্ধন সনদ প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য এবং রেস্তোরাঁর ১ বছরের জন্য ইস্যু করা হয়ে থাকে, যা পরবর্তীতে ৩ বছরের জন্য নবায়নযোগ্য।
    - হোটেল বা রেস্তোরাঁর ভবন কাঠামোগতভাবে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষিত হতে হবে
    - হোটেল বা রেস্তোরাঁর পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে যেন অতিথি বা ক্রেতাগণ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করেন
    - ৩ বা তদূর্ধ্ব তারকামানের হোটেল নির্মাণের পূর্বে সরকারের নিকট থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে
    - ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে
    - ব্যাবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অনুমতিপত্র গ্রহণ করতে হবে
    - বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো শর্তাবলি থাকলে তা পূরণ করতে হবে

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০

বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে পর্যটন শিল্পকে গড়ে তোলা তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে জাতীয় পর্যটন নীতির প্রধান লক্ষ্য। জাতীয় পর্যটন নীতির অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ–

ক) রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল, নীতি ও কর্মসূচিতে পর্যটন উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তকরণ

খ) বাংলাদেশে সুপরিকল্পিত পর্যটন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

গ) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে সমন্বিত রূপকল্প প্রণয়ন

ঘ) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও এলাকাভিত্তিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

ঙ) বিশ্বব্যাপী বিপণন চাহিদার নিরিখে পর্যটন আকর্ষণসমূহের

চ) পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বিপণন শ্রেণিভুক্তকরণ

ছ) পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান নিশ্চিতকরণ

জ) জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবদান নিশ্চিতকরণ

ঝ) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারের সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন

ঞ) পর্যটন আকর্ষণ ও সেবার মান নিশ্চিতকরণ ও এ উপলক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন

ট) দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান ও কর অব্যাহতির সুযোগ-সুবিধা প্রদান

ঠ) দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার

ড) বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ

ঢ) বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের সমন্বিত বিপণন ও ভাবমূর্তি উন্নয়নে ব্যবস্থা করা এবং বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহকে প্রচার ও প্রসারে সম্পৃক্ত করে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান

ণ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পর্যটন উন্নয়ন, বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ:

ত) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দূরবর্তী পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

থ) দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করা এবং প্রচার ও বিপণন

দ) গ্রামীণ পর্যটন, নৌ পর্যটন, কৃষি পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, ক্রীড়া পর্যটন, অল্টারনেটিভ ট্যুরিজম, কমিউনিটি পর্যটন ইত্যাদিও উন্নয়নসহ পর্যটন আকর্ষণসমূহের বহুমুখীকরণ

ধ) পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ন) সুলভ অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন

প) পর্যটন ও সেবাখাতের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মাধ্যমে পেশাগত জনবল সৃষ্টি

ফ) পর্যটন সেবা বিকাশে গবেষণা, বিপণন কর্মকৌশল ও মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

ব) পর্যটন শিল্পে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাংলাদেশের পর্যটনের তথ্য-উপাত্ত ইন্টারনেটে সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

ভ) পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন (ইটিজেড) ঘোষণার মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করা

ম) পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ এবং

য়) পর্যটন স্পটসমূহে স্যুভেনির তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা প্রদান

ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ৩ জুন ২০২০

শিরোনাম ও প্রয়োগ: (১) এই বিধিমালা ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়–

(ক) 'অধিক্ষেত্রে' অর্থ বিধি ৬-এ উল্লিখিত ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিটের অধিক্ষেত্রে;

(খ) 'ইউনিট প্রধান' অর্থ ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিটের নেতৃত্ব প্রদানকারী পুলিশ কর্মকর্তা;

(গ) 'ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট' বা 'ইউনিট' অর্থ ২১ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৫ আগস্ট ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ২৪৮-আইন/২০১৫ মূলে গঠিত পুলিশ বাহিনীর ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট;

(ঘ) 'ট্যুরিস্ট পুলিশ' অর্থ ইউনিটের কোনো পুলিশ সদস্য;

(ঙ) 'দর্শনীয় স্থান' অর্থ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ধর্মীয় স্থাপনা, চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক, ইকো-পার্ক, স্মৃতিসৌধ বা স্মৃতিস্তম্ভ সংবলিত স্থাপনা, হেরিটেজ, বিনোদন পার্ক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান;

(চ) 'পুলিশ আইন' অর্থ Police Act, 1861 (Act No. V of 1861);

(ছ) 'পুলিশ রেগুলেশন্স' অর্থ Police Regulations Bengal, 1943;

(জ) 'পর্যটক' অর্থ দর্শনার্থী বা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি তাহার স্বাভাবিক বসবাসের স্থান হইতে অন্য কোনো নুতন স্থানে উপার্জনমূলক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ব্যতীত পরিদর্শন, অবকাশযাপন, বিনোদন, ব্যাবসায়িক প্রয়োজন বা অন্য যেকোনো কারণে গমন করিয়া অনধিক ১ (এক) বৎসর অবস্থান করেন;

(ঝ) 'পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্থান বা স্থাপনা' অর্থ সেই সকল স্থান বা স্থাপনা, যেখানে দেশি-বিদেশি পর্যটকের সমাগম ঘটে;

(ঞ) 'পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধ' অর্থ পর্যটকদের শরীর বা সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোনো ফৌজদারি অপরাধ; এবং

(ট) 'ফৌজদারি কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V of 1898)1;

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমতো পুলিশ আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি, বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন) এবং পুলিশ রেগুলেশন্সে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। আইন, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা। এই বিধিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই, এইরূপ বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রযোজ্য ফৌজদারি কার্যবিধি, পুলিশ আইন ও তদধীন প্রণীত বা জারিকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, রেগুলেশন্স, আদেশ, নির্দেশনা, নীতিমালা, পরিপত্র, স্মারক এবং সরকার

কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ এবং প্রজ্ঞাপন ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। ইউনিটের কার্যালয় (১) ইউনিটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ইউনিটের কার্যাবলি পরিচালনার সুবিধার্থে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, দেশের যেকোনো স্থানে শাখা বা অধস্তন কার্যালয় স্থাপন করা যাইবে।

৫। ইউনিট পরিচালনা। (১) সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং মহাপুলিশ পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে, অন্যূন উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্য এবং অন্যান্য কর্মচারীর সমন্বয়ে, ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) ইউনিট প্রধান, ইউনিটের অধিক্ষেত্রে উহার কর্মপরিধিভুক্ত বিষয়ে, এই বিধিমালায় বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬। অধিক্ষেত্র ইউনিটের অধিক্ষের হইবে নিম্নরূপ। যথা–

(ক) বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০-এর ধারা ৪৩৫ মোতাবেক সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা এবং বিশেষ পর্যটন অঞ্চল;

(খ) দর্শনীয় স্থান এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্থান বা স্থাপনা এবং

(গ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে ঘোষিত বা নির্ধারিত যেকোনো অঞ্চল বা এলাকা

৭। ইউনিটের কার্যাবলি। ইউনিটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ। যথা–

(ক) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

(খ) তদন্তের জন্য প্রাপ্ত মামলার দ্রুত, গ্রহণযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত নিশ্চিতকরণ এবং

(গ) পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে অপরাধজনক ও গোয়েন্দা তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পুলিশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইউনিটের সহিত উক্ত তথ্যাদি বিনিময়।

৮। ট্যুরিস্ট পুলিশের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা। অধিক্ষেত্রের মধ্যে ট্যুরিস্ট পুলিশের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ। যথা–

(ক) বিধি ৩-এ উল্লিখিত আইন, বিধি, প্রবিধান, রেগুলেশন্স, আদেশ, নির্দেশনা, নীতিমালা, পরিপত্র, স্মারক ও প্রজ্ঞাপন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন;

(খ) ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি ক্ষমতাসহ তদন্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ;

(গ) দর্শনীয় স্থান এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্থান বা স্থাপনায় পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান;

(ঘ) পর্যটকদের অবস্থান, চলাফেরা ও ভ্রমণ নির্বিঘ্ন রাখিয়া যেকোনো ফৌজদারি অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে টহল প্রদান করা এবং অপরাধীদের পর্যবেক্ষণে রাখা;

(ঙ) পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের তদন্ত;

(চ) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন)-এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ছ) সংঘটিত পর্যটন সংশ্লিষ্ট অ-আমলযোগ্য অপরাধ (non-cognizable offence) সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান;

(ঝ) পর্যটন শিল্প ও পর্যটক সংক্রান্ত অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উহা অবহিতকরণ;

(ঞ) সংঘটিত পর্যটন সংক্রান্ত অপরাধসমূহের প্রকৃতি ও সংঘটনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অপরাধ চিত্র (crime mapping) ও অপরাধীদের তালিকা প্রস্তুত;

(ট) স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী, নাশকতার কর্মপরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও উদ্যোগ বা আয়োজন সম্পর্কিত আগাম তথ্য সংগ্রহ;

(ঠ) বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৭ নং আইন), বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য আইনসমূহ প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(ড) সরকার বা মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৯। ইউনিট কর্তৃক মামলার তদন্তকার্য পরিচালনা, ইত্যাদি। (১) ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট অধিক্ষেত্রে পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিষয়ক মামলার তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত তদন্তকার্য পরিচালিত হইবে। যথা–

(ক) কোনো ঘটনা সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা রুজু হইবে এবং ইউনিট উক্ত মামলার তদন্ত করিবে;

(খ) Crime scene management হইতে মামলা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত থানা পুলিশ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো পুলিশ ইউনিট ঘটনাস্থল সংরক্ষণ, প্রাথমিক তদন্ত ও আসামি গ্রেফতার করিবে;

(গ) ইউনিট কোনো মামলার তদন্ত কার্যক্রম আরম্ভ করিলে মহাপুলিশ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো সংস্থায় উক্ত মামলা হস্তান্তর করা যাইবে না, তবে ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন কর্তৃক একই সময়ে কোনো মামলা তদন্তের বিষয় উত্থাপিত হইলে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট উক্ত মামলা তদন্ত করিবে; এবং

(ঘ) পুলিশ কমিশনার বা ক্ষেত্রমতো, জেলা পুলিশ সুপারকে পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধের মামলা হস্তান্তর করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে অনতিবিলম্বে পুলিশ কমিশনার বা ক্ষেত্রমতো, জেলা পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিটের নিকট তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট মামলা হস্তান্তর করিবেন;

(২) পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধ ছাড়াও ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট আদালত, সরকার বা মহাপুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অপরাধের তদন্তকার্য পরিচালনা করিবে;

(৩) এই বিধিমালার অধীনে সুষ্ঠু তদন্তকার্য পরিচালনার প্রয়োজনে ট্যুরিস্ট পুলিশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;

১০। গ্রেফতার, পলায়ন ও পুনরায় গ্রেফতার, সমন, ক্রোক, তল্লাশি, ইত্যাদি। বিধি ৩ এবং ৮-এর সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে গ্রেফতার, পলায়ন ও পুনরায় গ্রেফতার, সমন, ক্রোক, তল্লাশি এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যক্রমের

ক্ষেত্রে ট্যুরিস্ট পুলিশ, ফৌজদারি কার্যবিধি বা ক্ষেত্রমত, পুলিশ রেগুলেশন্সের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসরণ করিবে;

১১। তদন্ত সম্পন্নের সময়সীমা। পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা হস্তান্তরিত কোনো অপরাধের মামলার তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইনে নির্ধারিত সময়সীমার, যদি থাকে, মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন;

১২। ইউনিটের কার্যক্রমে পুলিশ কমিশনার বা জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব। ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার বা ক্ষেত্রমত, জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ। যথা–

(ক) অধিক্ষেত্রে পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্তের প্রয়োজনে আসামি গ্রেফতার ও তল্লাশিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক জনবল, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য লজিস্টিকসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(খ) আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সভা বা অপরাধ পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় ইউনিটের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

(গ) তথ্য ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

১৩। পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য ইউনিটের সহিত সমন্বয় সাধন। ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট–

(ক) প্রশাসনিক, লজিস্টিক্স, তদন্তকার্য ও অপারেশন সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য ইউনিটের সহিত সমন্বয় সাধন করিবে;

(খ) পুলিশ বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখা, বিভাগ, সংস্থা বা ইউনিটের সহায়তা গ্রহণ করিবে;

(গ) তদন্ত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিষয় এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন ও পাঠ্যক্রম উন্নয়নে পুলিশ বাহিনীর সংশ্লিষ্ট শাখা, বিভাগ, সংস্থা বা ইউনিটের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে;

১৪। লিগ্যাল সেল। ইউনিটের প্রধান কার্যালয়ে একটি লিগ্যাল সেল থাকিবে, যাহার কার্যক্রম হইবে নিম্নরূপ। যথা–

(ক) রিট পিটিশন, আইনগত নোটিশ, নারাজি দরখাস্ত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, রিভিউ, ডিমান্ড অব জাস্টিস নোটিশ, আদালত অবমাননা, ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(খ) বিচার প্রক্রিয়ায় আইনানুগ লক্ষ্য অর্জনের জন্য, মামলার তদন্তের যেকোনো পর্যায়ে অথবা তদন্তকার্য সমাপ্ত হইবার পর বা বিচারকার্য শুরু হইবার পর, ক্ষেত্রমতো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, অফিস, সরকারি কৌঁসুলি, সলিসিটর, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, আদালত এবং প্রসিকিউশন উইংয়ের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন করা।

১৫। সাধারণ ডায়েরি, পরামর্শ বহি, পরিদর্শন বহি, ইত্যাদি সংরক্ষণ। ইউনিট, পুলিশ আইন, পুলিশ রেগুলেশন্স এবং বাংলাদেশ পুলিশ ফরম অনুযায়ী সাধারণ ডায়েরি, পরামর্শ বহি, পরিদর্শন বহিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবে।

১৬। হেফাজত: এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট কর্তৃক

(ক) কৃত বা সম্পাদিত সকল কার্যাদি, এই বিধিমালার সহিত অসাম্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন কৃতক বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত কার্য বা কার্যধারা, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন হইবে।

উপর্যুক্ত আইন ও বিধি ছাড়াও পর্যটন সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিধি ও অধ্যাদেশ রয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো–

ইমিগ্রেশন

দ্য ইমিগ্রেশন অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশের কিংবা বহির্গমনের জন্য নির্ধারিত পথ ব্যবহার করতে হবে। এই সময়ে তিনি প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ডকুমেন্ট ইমিগ্রেশনে প্রদর্শন করবেন। বৈধ কাগজপত্র যেমন পাসপোর্ট, ভিসা বা রেসিডেন্স/ ওয়ার্ক পারমিট, টিকিট, অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বহনের অনুমতি বা এন্ডার্সমেন্ট ইত্যাদি ছাড়া কিংবা জাল কাগজপত্র নিয়ে ভ্রমণের চেষ্টা করা আইনত দণ্ডনীয়। বাংলাদেশ পুলিশের

বিশেষ শাখার (Special Branch SB) আয়ত্তাধীন প্রশিক্ষিত ইমিগ্রেশন পুলিশ এই সকল ভ্রমণ দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে যাত্রীগণকে চূড়ান্তভাবে ভ্রমণ অনুমতি দিয়ে থাকে। আগত ভিসাবিহীন যাত্রীদের অনুকূলে ইমিগ্রেশন পুলিশ বিধিমত আগমনী ভিসা ইস্যু করে থাকে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ব্রুনেইসহ ৭০টিরও বেশি দেশের নাগরিকদেরকে বাংলাদেশ ভ্রমণে আগমনী ভিসা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশেষ শাখার সাথে বিমানবন্দরের অনলাইন টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে তা পরিচালিত হয়। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির তালিকা ইমিগ্রেশন পুলিশের ডেটাবেজে সবসময়ই হালনাগাদ থাকে। ফলে এরূপ কেউ বিমান কিংবা সড়কপথে বিদেশে পাড়ি দিতে চাইলে কিংবা দেশে আসলে তা ইমিগ্রেশনের কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে ধরা পড়ে। সন্ত্রাসীদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষায় ইমিগ্রেশনের ভূমিকা অপরিসীম। সম্প্রতিকালে ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠিত হওয়ায় তারা পর্যটকদের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা আরও সহজতর করে তুলবে।

ব্যাগেজ রুলস

'ব্যাগেজ' বলতে বিদেশ থেকে আগত কোনো যাত্রী কর্তৃক আমদানিকৃত যুক্তিসংগত পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, গৃহস্থালি অথবা অন্যবিধ ব্যক্তিগত সামগ্রীকে বোঝায়। বিদেশি পর্যটক যারা অন্যূন ২৪ ঘণ্টা এবং সর্বোচ্চ ৬ মাস বাংলাদেশে অবস্থান করবেন তাদের ক্ষেত্রে পর্যটক ব্যাগেজ (আমদানি) রুলস ১৯৮১ প্রযোজ্য হবে।

কাস্টমস

'বাংলাদেশ কাস্টমস' জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস আইন ২০১৪ দ্বারা পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। শুল্ক বা কর প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হোক বা না হোক, বাংলাদেশে প্রবেশ করে বা বাংলাদেশ থেকে বাইরে যায় এমন সকল পণ্য কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের অধীন হবে। স্থলবন্দরে স্থল কাস্টমস স্টেশন, নৌবন্দরের কাস্টমস বন্দর ও বিমানবন্দরে কাস্টমস বিমানবন্দর নামে কাস্টমস হাউজগুলো কাজ করছে। এরা সাধারণত আমদানি বা রপ্তানি পণ্যের ওপর সরকার কর্তৃক আরোপিত হারে কাস্টমস শুল্ক আদায় করে। পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য যেমন নকল মুদ্রা, অশ্লীল পুস্তক বা ভিডিও, নকল ভৌগোলিক নির্দেশকযুক্ত পণ্য, মিথ্যা

বাণিজ্যিক বর্ণনা সংবলিত পণ্য, বাংলাদেশের বাইরে প্রস্তুতকৃত হিসেবে বাংলাদেশের সিল ব্যবহার করা হয়েছে, কপিরাইট আইন ২০০০ কোনো পণ্য দেশে প্রবেশ না করতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করা কাস্টমসের কাজ। উল্লেখ্য যে, এরূপে আসা পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রী দায়িত্বশীল কাস্টমস কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ধ্বংস করার আইনি বিধান রয়েছে। অবৈধ মালামাল বহন যেমন সোনা চোরাচালান কাস্টমস তা জব্দ করাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করার আইনি ক্ষমতা রাখে। কাস্টমস নিচের পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

- সাময়িক আমদানি
- ইনওয়ার্ড প্রসেসিং
- আউটওয়ার্ড প্রসেসিং
- কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং
- ট্রানজিট
- ট্রানশিপমেন্ট
- রসদ ও ভান্ডার সামগ্রী এবং
- রপ্তানি

কাস্টমস বাংলাদেশে আগমনকারী কোনো যাত্রী বা পর্যটক বা ক্রু তার ব্যাগেজ পরীক্ষা করতে পারবে এবং পরীক্ষাকালীন সময়ে কাস্টমস কর্মকর্তা উক্ত যাত্রীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। যাত্রীর ব্যাগেজের কোনো পণ্য শুল্কযোগ্য হলে বা আমাদানি নিষিদ্ধ হলে বা নিয়ন্ত্রিত হলে উক্ত পণ্য কাস্টমস আটক রাখতে পারবে। তবে ব্যাগেজের ক্ষেত্রে ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী প্রযোজ্য শুল্কহারে তারা শুল্ক আদায় করতে পারবেন। আগত কিংবা বিদেশগামী পর্যটকরা কী ধরনের কত পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পরিবহণ করতে পারবেন, কাস্টমস তা আইনসম্মতভাবে ব্যবস্থা করবে।

বৈদেশিক মুদ্রা

বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী উভয় ধরনের ভ্রমণেই বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বিদেশ ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক কোটা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে। একজন পর্যটক কোন পথে ভ্রমণে যাবেন তার ওপর নির্ভর করে কোটা নির্ধারিত হয়। তিনি বিদেশে গিয়ে ব্যয়ের জন্য কত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা

সঙ্গে নিতে পারবেন। দৈশিক মুদ্রা সময় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ডিলার ব্যাংক কিংবা অননুমোদিত মানি একচেঞ্জের নিকট থেকে মুদ্রা এবং তার বিপরীতে পাসপোর্টে এনডোর্সমেন্ট করিয়ে নিতে হবে। দেশি কিংবা বিদেশি কোনো আগত যাত্রী বাংলাদেশে প্রবেশের সময় ঘোষণা ব্যতিরেকে ৫০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অন্য কোনো বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে করে আনতে পারবেন। তবে তার বেশি হলে অবশ্যই নির্ধারিত ফরমে ঘোষণা দিতে হবে।

অধ্যায় ৮

ট্যুরিস্ট পুলিশের গঠন, ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা

Structure, History and Necessity of Tourist Police

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে মানুষ ভ্রমণের সহজাত নেশায় দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। গত অর্ধশতক জুড়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি ক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে এবং পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন সম্ভাবনাময় দেশ। পৃথিবীর দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় সমুদ্র সৈকত, একক সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত চা বাগান, দিগন্তবিস্তৃত হাওড়-বাঁওড়, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, ঐতিহ্যবাহী লোকজ উৎসব ও লোক শিল্প, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট বাংলাদেশকে করেছে আকর্ষণীয় ও সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থানে। সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশ ও কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনে এই বহুমাত্রিক পর্যটন ও সেবা শিল্প বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। এসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, ২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ও ২০১৩ সালে পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠিত হয়।

ট্যুরিস্ট পুলিশের গঠন

পর্যটন শিল্প বিকাশে অন্যতম প্রধান শর্ত ট্যুরিজম সিকিউরিটি। পর্যটন শিল্পকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার চাদরে আবৃত করে দেশের সমৃদ্ধ অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ঘোষণা করে। নীতিমালার ৬.৯ অনুচ্ছেদে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ট্যুরিস্ট স্পটসমূহে ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি স্থানভেদে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী নিয়োজিতকরণের কথা উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে ট্যুরিজম সিকিউরিটি নিশ্চিতকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর 'ট্যুরিস্ট পুলিশ' নামে বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করা হয়। ৩ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখে ট্যুরিস্ট পুলিশের বিধি গেজেট আকারে জারি হয়। বাংলাদেশকে পর্যটকদের জন্য একটি নিরাপদ গন্তব্যে পরিণত করা ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে শুরু থেকেই ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিশন

বাংলাদেশের মনোরম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যমণ্ডিত পরিবেশ
পর্যটকদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিতকরণ

মিশন

ট্যুরিস্ট পুলিশ ভদ্র, সৌজন্যমূলক এবং সদাচরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি পর্যটনস্থলে পর্যটকদের ভ্রমণে উৎসাহিত করবে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে–

- নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত
- মনোরম পরিবেশ প্রস্তুত
- আস্থা বৃদ্ধি
- আইনগত সহায়তা প্রদান
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং
- সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করবে

বর্তমান অফিস ও জনবল

- ট্যুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফারইস্ট টাওয়ার, লেভেল ০৮, ০৯ ও ১০ ৩৫, তোপখানা রোড, ঢাকা
- ৪টি ডিভিশন
- ডিভিশন-১ (ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ)
- ডিভিশন-২ (চট্টগ্রাম বিভাগ)

- ডিভিশন-৩ (খুলনা ও বরিশাল)
- ডিভিশন-৪ (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ)
- ১১টি রিজিয়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুর রিজিয়ন)
- ৪২টি জোন
- অপারেশনাল জেলা ৩২টি

বর্তমান অনুমোদিত জনবল

অতি. আইজিপি	১
ডিআইজি	১
অতি. ডিআইজি	৪
এসপি	১৬
অতি. এসপি	১২
এএসপি	১১
পুলিশ পরিদর্শক	৮৬
এসআই/সার্জেন্ট	২২২
এএসআই	২৮৬
নায়েক	৮০
কনস্টেবল	৫৯২
সিভিল স্টাফ	২০
ক্লিনার ও বাবুর্চি	৬৩
মোট	**১৩৯৪**

অধিক্ষেত্র

ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০২০-এর প্রবিধি ৬ মোতাবেক অধিক্ষেত্র

(ক) বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ৪ ও ৫ মোতাবেক সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা এবং বিশেষ পর্যটন অঞ্চল

খ) দর্শনীয় স্থান এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্থান বা স্থাপনা

বর্তমান ডিউটি স্পট

- জেলা ৩২টি
- বর্তমানে আয়ত্তাধীন পর্যটন স্পট ১১৫টি

ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যক্রম

- ট্যুরিস্টদের শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- ট্যুরিস্টদের শরীর ও সম্পত্তি সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলার গুণগত তদন্ত নিশ্চিতকরণ
- পর্যটন স্পটসমূহে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা
- দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান
- পর্যটকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ
- চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইমুক্ত পর্যটন এলাকা নিশ্চিতকরণ
- ইকো-ট্যুরিজম ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- ট্যুরিস্ট স্পটসমূহে পর্যটকদের তাৎক্ষণিক তথ্যসেবা প্রদান এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- হ্যালো ট্যুরিস্ট অ্যাপস, ফেসবুক, ওয়েবসাইট, হটলাইনসহ বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে পর্যটকদের সচেতনতা বৃদ্ধি

ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রয়োজনীয়তা

- স্বাগত জনগোষ্ঠীর জীবনাচারে তাদের বিশ্বাস, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির যে অবদান ও অবস্থান আছে তা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এগুলো বিনষ্ট হলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে জাতিসত্তা হুমকির মুখে পড়বে। ট্যুরিস্ট পুলিশ এ ধরনের কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবে
- একটি পর্যটন গন্তব্যে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যনির্মিত সম্পদ আছে। এগুলো পর্যটনের প্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণগুলোর ওপর ভিত্তি করেই একটি গন্তব্যে প্রতিদিন নতুন নতুন পর্যটকরা ছুটে আসেন। জেনে অথবা না জেনে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আমরা প্রতিনিয়ত এ সকল পর্যটন সম্পদ নষ্ট করে ফেলছি। আবার গণপর্যটনের প্রভাবেও অনেক পর্যটন সম্পদ টেকসই হয় না। এই সমস্ত পর্যটন সম্পদ রক্ষা করতে না পারলে

আমাদের পর্যটন ধ্বংস হয়ে যাবে। ট্যুরিস্ট পুলিশ স্থানীয় গণমানুষকে সঙ্গে নিয়ে সকল পর্যটন সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে

- পর্যটন পৃথিবীর প্রথম শান্তির শিল্প এবং প্রত্যেক পর্যটকই একজন সম্ভাব্য শান্তির দূত। পর্যটক না থাকলে পর্যটন সম্পদের কোনো মূল্য নেই। আবার পর্যটকদের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাংস্কৃতিক বিনিময় উভয়কেই সমৃদ্ধ করে। তাই পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য একদিকে যেমন পর্যটন সম্পদ/আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হয়, অন্যদিকে গন্তব্য নিরাপত্তা নিশ্চিত না করতে পারলে পর্যটকদের আগমন ও চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে। ট্যুরিস্ট পুলিশ এ কাজ অবশ্যই নিশ্চিত করতে পারে। তবে এতদ্‌বিষয়ক কলাকৌশল জেনে সেবা প্রদান করলে তা অনেক বেশি কার্যকর হয়

অধ্যায় ৯

পর্যটনে অপরাধ প্রতিরোধ

Crime Prevention in Tourism

অপরাধ পর্যটনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এবং এই শিল্পের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কোনো গন্তব্যে অপরাধ সংঘটিত হলে জনশক্তি থাকলেও তা পর্যটকদেরকে ভীত করে তুলতে পারে। তাই পর্যটন গন্তব্যে অপরাধ সংঘটন রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পর্যটনে সাধারণত যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয় বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সেগুলো নিম্নরূপ–

ছিনতাই (Larceny)

যেকোনো গন্তব্যে ছিনতাই একটি সাধারণ অপরাধমূলক ঘটনা। ছিনতাই অপরাধ হিসেবে বড়ো না হলেও পর্যটকদের জন্য বেশ বিড়ম্বনাকর। অনেক সময় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে পর্যটকরা ছুরিকাহত হন, এমনকি নিহত পর্যন্ত হন। ছিনতাই রোধকল্পে ট্যুরিস্ট পুলিশ স্থানীয় জনগণের সাথে যৌথ প্রয়াসে সহজেই ছিনতাই রোধ করতে পারে।

চুরি (Theft)

ছিনতাইয়ের মতো চুরিও একটি গন্তব্যের আরেকটি বিড়ম্বনাকর অপরাধ। চুরি পর্যটকদেরকে এতটা ভীতিকর অবস্থায় ফেলে না দিলেও কখনো বেশ বিপদে ফেলে দেয়। একজন বিদেশি পর্যটকের পাসপোর্ট ও নগদ অর্থ চুরি হলে সত্যিকার অর্থেই তিনি বিরাট সংকটে নিপতিত হন। এতে দেশের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়।

দস্যুতা (Robbery)

একটি পর্যটন গন্তব্যে সংঘবদ্ধভাবে এই অপরাধ সংঘটিত হয়। দস্যুতার কবলে পর্যটকেরা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন ও ব্যক্তিগত সম্পদ হারান। বাংলাদেশে দস্যুতার ঘটনা কম। তবে এর প্রকোপ যেন না বাড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ধর্ষণ (Rape)

ধর্ষণ পর্যটন গন্তব্যের ইমেজ সংকটের অন্যতম বিষয়। এই ধরনের অপরাধ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সংকট সৃষ্টি। সামাজিক এবং আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্যুরিস্ট পুলিশকে এই ধরনের অপরাধ মোকাবিলায় শতভাগ সচেষ্ট থাকতে হবে।

খুন (Murder)

পৃথিবীর বিভিন্ন গন্তব্যে পর্যটক খুনের ঘটনা খুবই কম, তবে বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। পারস্পরিক স্বার্থ নিয়ে নিষ্পত্তির অযোগ্য বিরোধের জন্য সাধারণত খুন হয়। এই ধরনের অপরাধ রোধে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কাবস্থায় থাকতে হবে। খুনের ঘটনা পর্যটকদের ভীত করে এবং একটি গন্তব্যের প্রতি নানাভাবে বিমুখ করে।

নকল (Pyracy)

নকল প্রবণতার জন্য সংঘটিত অপরাধ পর্যটনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিশেষত সাংস্কৃতিক বিষয়, যেমন গান ইত্যাদি একটি স্থানে নকল করা হলে তা ওই গন্তব্যের ইমেজকে খাটো করে। এ জাতীয় অপরাধ পর্যায়ক্রমে অন্য অপরাধের জন্ম দেয়।

অপহরণ (Kidnapping)

পর্যটকরা শারীরিকভাবে একটি গন্তব্যে গমন করেন বিধায় অপহরণ তাদেরকে ব্যাপকভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। বিশেষত নারী ও শিশু পর্যটকরা এ জাতীয় অপরাধকে ভীষণভাবে ভয় পান। মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহরণও ভীতিকর অবস্থা তৈরি করে। অপহরণ এভাবে একটি গন্তব্যের ইমেজ সংকট তৈরি করে। তাই কোনো পর্যটন গন্তব্যকে অপহরণ মুক্ত রাখা জরুরি।

উপর্যুক্ত অপরাধসমূহ ৪ রকমভাবে সংঘটিত হয়–

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক পর্যটকদের বিরুদ্ধে
- পর্যটক কর্তৃক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে

- পর্যটক কর্তৃক পর্যটকদের বিরুদ্ধে এবং
- পর্যটন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে

অপরাধ যেভাবেই সংঘটিত হোক না কেন, চূড়ান্ত বিবেচনায় পর্যটকদের মনস্তত্ত্বের ওপর তা ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। তাই সকল অপরাধ দূরীকরণের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। যেসব হুমকি পর্যটন শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে, তা নিম্নরূপ–

স্থানীয় হুমকি

পর্যটন মানেই হলো একটি গন্তব্যে বাইরের মানুষের অবারিত আগমন ও চলাচল। তাই এর বিকাশের সাথে সাথে একটি গন্তব্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, জীবনধারা ও অর্থনীতির ওপর ধনাত্মক প্রভাবের পাশাপাশি বেশকিছু হুমকিও পরিলক্ষিত হতে পারে। নিচে এ জাতীয় কতিপয় বিষয় উপস্থাপন করা হলো–

পরিবেশের ওপর প্রভাবজনিত হুমকি

কোনো গন্তব্যে অতিরিক্ত পর্যটকের আগমন ঘটলে তাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা স্থানীয় পরিবেশের বেশকিছু ক্ষতি হতে পারে। জীবের বাস্তুসংস্থান, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদির ওপর এমন কোনো প্রভাব পড়তে পারে যা তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়ে ওঠা ও টিকে থাকার জন্য বেশ হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির হুমকি

পর্যটন চাহিদা ওঠা-নামার জন্য স্থানীয় সরবরাহকারীরা সংকটে পড়তে পারে। আবার পর্যটন ও স্থানীয় মানুষ কর্তৃক ব্যবহারের ফলে চাহিদা বাড়ার জন্য নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে পারে। অনিয়মিত পর্যটকদের আগমন ও দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের কাঙ্ক্ষিত মানসম্মত সেবাদানের পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।

জনাকীর্ণতা

শহর, সমুদ্র সৈকত বা বিশেষ পর্যটন আকর্ষণের প্রতি ঋতুভিত্তিক বা অন্য কোনো কারণে একই সময়ে অধিক পর্যটকের আগমন ঘটলে উক্ত স্থানে জনাকীর্ণতা দেখা দেয়। ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যেতে পারে, শব্দ দূষণ হতে পারে যা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে।

অপরিকল্পিত ভৌত উন্নয়ন

অপরিকল্পিত ভৌত উন্নয়ন একটি স্থানের স্বাভাবিক অবস্থাকে ভেঙে ফেলতে পারে। পর্যটকদের আগমন বাড়ার সাথে সাথে বহু ধরনের সেবা সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু এই সময় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপায়ে সড়ক, আবাসন ইত্যাদি গড়ে না উঠলে একদিকে যেমন গন্তব্যের সৌন্দর্য নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি সেবাদানের মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়। স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার ওপর এ জাতীয় উন্নয়ন স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ

পর্যটন গন্তব্যে বাইরের মানুষের বিনিয়োগ বাড়লে এবং সেবাদানের সুযোগ তাদের হাতে চলে গেলে সংগত কারণেই স্থানীয় মানুষের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে স্থানীয় মানুষের পর্যটক সেবাদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ হ্রাস পাবে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যটনকে ধারণ করবেন না এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় ওই স্থানের পর্যটনের সেবামান মূল্য হারাবে।

অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা

একটি গন্তব্য পর্যটকদের চাহিদা মতো সব উৎপাদন করতে পারবে না তা ঠিক। তবে তাদের উৎপাদিত দিয়ে তারপর দ্রব্য আমদানির পরিকল্পনা করতে হবে। স্থানীয় মানুষের জ্ঞান ও কৌশলকে প্রয়োজনে মানোন্নয়ন করে হলেও তাদের দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে দীর্ঘ অর্থনৈতিক বিপর্যয় গন্তব্যের আকর্ষণগুলোকেও নষ্ট করে ফেলতে পারে।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

পর্যটনের মাধ্যমে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। উভয় পরিবর্তনে দেশীয় বা স্থানীয় সংস্কৃতি তার মূল অবয়ব থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, যা কাম্য নয়। পরিবর্তনের ফলে উৎকর্ষ সাধনকে গ্রহণ করা যায়, তবে মূল ধারা থেকে বিচ্যুতি গ্রহণযোগ্য নয়। স্থানীয় মানুষকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কী চান? একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কোনো অবস্থাতেই তাদের মৌলিক আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে না।

সন্ত্রাস

সন্ত্রাস একটি গন্তব্য সম্বন্ধে পর্যটকের আস্থা ও প্রতিমূর্তিকে বিনষ্ট করে দেয়। গন্তব্য ইমেজ একটি গন্তব্যের সকল প্রডাক্ট বা আকর্ষণসমূহকে ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ ও

ক্রয়সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করে। গন্তব্য ইমেজ তৈরি হয় তার নানান উপাদান যেমন– প্রাকৃতিক ও মনুষ্য নির্মিত পর্যটন সম্পদ, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, পেশার বহুমুখিতা, জলবায়ুগত উপাদান, আবহাওয়ার বিশুদ্ধতা, লোকজ উপাদান, স্থানীয় খাদ্যের বৈচিত্র্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি দিয়ে। কিন্তু সন্ত্রাস একটি গন্তব্যকে অন্য গন্তব্যের সাথে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে। ফলে গন্তব্য ইমেজের নিশ্চিত অর্থনৈতিক মূল্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওপরে বর্ণিত হুমকিসমূহ একটি পর্যটন গন্তব্যের পর্যটনের মান হ্রাস করে, পর্যটকদের সেবার মান হ্রাস করে এবং চূড়ান্তভাবে পর্যটকদের নিরাপত্তাও হ্রাস করে। কেননা স্থানীয় বা স্বাগত জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া কোনো অবস্থাতেই পর্যটকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক হুমকি

আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস হলো পর্যটনের ২টি বড়ো আন্তর্জাতিক হুমকি, যা পর্যটকদের জানমালের নিরাপত্তার ওপর বড়ো হুমকি। এই হুমকি পর্যটক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্য বড়ো বাধা। এতে অর্থনীতি ক্ষতির মধ্যে পড়ে। নিচে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

আন্তর্জাতিক রাজনীতি

বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি হলো রাজনৈতিক অর্থনীতি। একটি দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে সেই দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, কূটনীতি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর। ফলে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা একান্ত অপরিহার্য। শুধু ক্ষমতাসীন দল নয়, অর্থনীতি সচল রাখার জন্য রাষ্ট্রের সকল দলের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি। দেশে দেশে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করার পূর্বশর্তও সেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থান ও অবদান।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস

সন্ত্রাস কখনোই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং যেকোনো গন্তব্যের সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক বহুমুখিতাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে পর্যটন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সন্ত্রাস সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে এবং মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলে। বর্তমান বিশ্বে পর্যটন আয় বৃদ্ধির একটি

বড়ো ক্ষেত্র হলেও এই খাত অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একটু কিছু হলেই তা আগত পর্যটকদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং সাধারণ আগমন বিঘ্নিত হয়। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলে পর্যটন বাজার দ্রুত পড়তে থাকে এবং অর্থনীতি হুমকির মধ্যে পড়ে। সুতরাং পর্যটনকে বাঁচাতে হলে যেকোনো সন্ত্রাস মোকাবিলা এবং সন্ত্রাস এড়িয়ে চলার কোনো বিকল্প নেই।

উপর্যুক্ত অপরাধসমূহ ছাড়াও একটি পর্যটন গন্তব্যে নিম্ন বর্ণিত ৩ ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়–

অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস

অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থ, বিশ্বাস, ধর্ম কিংবা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করা না গেলে শেষ পর্যন্ত তা সন্ত্রাসে রূপ নেয়। উদ্ভূত দ্বন্দ্ব পর্যায়ক্রমে বিবদমান গোষ্ঠীসমূহকে মেরুকরণ করে এবং পরবর্তীতে তা সন্ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু থেকে যায় এর গুপ্ত বীজ। ফলে একে সমূলে উৎপাটন করতে হলে সামাজিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। সন্ত্রাস পর্যটনের অন্যতম ধ্বংসকারী নিয়ামক (Destructive Factor)।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস

এই ধরনের সন্ত্রাসের উৎপত্তিস্থল এক দেশে হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তা ছড়িয়ে পড়ে ও ধ্বংসলীলা চালায়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের সাথে বিপুল অর্থ, অস্ত্র, মেধা, শ্রম, শক্তি, ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের সমন্বিত প্রয়াস জড়িত থাকে। বড়ো ও হীনস্বার্থ রক্ষার্থে তা ব্যবহৃত হয়। ইন্টারপোল বা অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র বজায় রেখে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পর্যটনকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সীমান্ত সন্ত্রাস

আমাদের মতো দেশের জন্য সীমান্ত সন্ত্রাস পর্যটনের জন্য হুমকিস্বরূপ। কেননা কেবল দক্ষিণ দিক ছাড়া তিন দিকেই রয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত। ফলে সীমান্ত সন্ত্রাস মোকাবিলায় আমাদেরকে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলার কোনো বিকল্প নেই। সফল কূটনীতি এই ধরনের সন্ত্রাস রোধে অনেকটা ভালো ফল দেয়।

উপর্যুক্ত সন্ত্রাসগুলো ৩ রকমভাবে সংঘটিত হয়–

ক) সিভিল জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাস যার শিকার হন পর্যটকরা

খ) অর্থনীতিকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাস যার শিকার হয় পর্যটন

গ) মিডিয়াকে ব্যবহার করে সন্ত্রাস যার শিকার হয় পর্যটক ও পর্যটন উভয়ই

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে অপ্রকাশিত কিছু বিষয়ে সম্পৃক্ততা নানা ধরনের অপরাধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও পর্যটনের চলমান সেবা প্রদানকে ব্যাহত করে। তাই একটি দেশে পর্যটন অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলে দলগুলো রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে পারেন।

ধর্মঘট

এর অর্থ কর্মবিরতি। কর্মবিরতি পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত কোনো খাতে হলে তা প্রত্যক্ষভাবে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলবে। আর যদি পরোক্ষ হয়, তাহলে প্রভাব একটু বিলম্বে পড়বে। আবার পর্যটন বিচ্ছিন্ন কোনো খাতও যদি হয়, তাহলেও পরোক্ষভাবে সেই গন্তব্যের ইমেজ সংকট তৈরি করতে পারে। সুতরাং সকল ধর্মঘট পর্যটনের জন্য ক্ষতিকর এবং একে কেন্দ্র করে কোনো কোনো অপরাধ সংঘটনের সুযোগ তৈরি হয়।

হরতাল

এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সকল কর্মযজ্ঞের বিরতি। সকল হরতাল পর্যটন সেবা উৎপাদন ও সরবরাহ শিকলে প্রত্যক্ষ সংকট তৈরি করে। উপরন্তু পর্যটকদের স্বাধীন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে হরতাল পর্যটন শিল্পের প্রত্যক্ষ অন্তরায়। আবার হরতাল সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হতে পারে, যা একটি গন্তব্যের স্থায়ী ইমেজ সংকট তৈরি করে।

ধ্বংসাত্মক আন্দোলন

এই ধরনের আন্দোলন বর্তমান বিশ্বে কেউই গ্রহণ করে না। আন্দোলনের জন্য ধ্বংসলীলা কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা পর্যটনের মতো শান্তির শিল্পে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন নিঃসন্দেহে বর্জনীয়। রাজনৈতিক কিংবা অরাজনৈতিক উভয় প্রকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলন থেকে পর্যটনকে রক্ষা করা একটি দেশে সরকার, সাধারণ মানুষসহ সকলের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব।

গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ও রায়ট

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিরোধের কারণে সাধারণত দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু যথানিয়মে নিষ্পত্তি করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত তা রায়টে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তানি আমলে এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। রায়টের মাধ্যমে বিবদমান মানুষের জানমালের অগণিত এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই এর পুনরাবৃত্তি না হোক এই প্রচেষ্টায় আমাদের শতভাগ সফলতা দরকার।

পর্যটন কেন্দ্রগুলোর অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। সকল স্টেকহোল্ডারগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একটি পর্যটন গন্তব্যকে নিরাপদ ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। পর্যটন গন্তব্যকে সুরক্ষিত করতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে–

- দায়িত্বশীল স্টেকহোল্ডার তৈরি করা
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিয়মিত মনিটরিং
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যকরী ভূমিকা
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান
- ট্যুরিস্ট পুলিশের নিয়মিত টহল
- তথ্য সরবরাহ/ব্যবস্থাপনা
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির কার্যকরী ভূমিকা
- স্টেকহোল্ডারদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি
- গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ

পর্যটকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

ভোক্তা হিসেবে একজন পর্যটকের নিরাপত্তাসহ নানা ধরনের অভিযোগ থাকতে পারে। পর্যটনের আন্তর্জাতিক ন্যায্যতা বিচারে একজন পর্যটক কতটুকু সেবা পেল তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সেবার সাধারণ মানদণ্ডে নিরাপত্তাসহ কতটুকু সেবা সরবরাহকারী কিংবা ট্যুর অপারেটরগণ প্রদান করতে পেরেছেন তার ওপর পর্যটনের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। নানান প্রেক্ষাপট থেকে জনমনে ট্যুরিস্ট পুলিশকে কেন্দ্র করে আশার সঞ্চার হওয়া খুব একটা অমূলক নয়। পর্যটকদের

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করতে হলে পর্যটনের সার্বিক অবয়ব ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। পর্যটনের অবদান অর্থনৈতিক শক্তির গুরত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে তা গন্তব্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।
ট্যুরিস্ট পুলিশকে অবশ্যই এতদ্বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। কারণ সাধারণ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সাথে পর্যটকদের অভিযোগ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নজরদারি

ট্যুরিস্ট পুলিশ পর্যটন স্পটে অপরাধ প্রতিরোধে আইন অনুযায়ী যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে–

অপরাধী শনাক্তকরণ বিষয়ক কার্যক্রম

- তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বে অফিসারকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার দেখতে হবে। প্রবিধান-২৫৬
- সরেজমিনে তদন্ত। প্রবিধান-২৫৮
- মৃতপ্রায় ঘোষণা। প্রবিধান-২৬৬
- অভিযোগ পত্র। প্রবিধান-২৭২
- তদন্তের পুনরুজ্জীবন। প্রবিধান-২৭৭
- সন্দেহজনক ব্যক্তিকে শনাক্তকরণ প্রয়োজন। প্রবিধান-২৮২
- স্বীকৃতির যথার্থতা নির্ণয়। প্রবিধান-২৮৩
- অনুসন্ধানের জন্য দলিলপত্র পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ। প্রবিধান-২৯৪
- বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ এবং রাসায়নিক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের নিকট উপস্থাপনের বস্তু প্রেরণ। প্রবিধান-২৯৭
- অস্বাভাবিক ও সন্দেহমূলক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তদন্ত প্রথম অভিযোগ পেশ করতে হবে। প্রবিধান-২৯৯- ৩০০
- পোস্টমর্টেম পরীক্ষা ও রিপোর্ট। প্রবিধান-৩০৬
- অনুসন্ধানের জন্য অশনাক্তকৃত মৃত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ পেশ করা। প্রবিধান-৩১৩
- অপরিচিত মৃতদেহের ফটো গ্রহণ। প্রবিধান-৩১৪

- অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ এবং পুলিশ হেফাজতে আটকাবস্থার আবেদন। প্রবিধান-৩২৪

অপরাধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

- অপরাধ দমন এবং আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ। প্রবিধান-১১৮
- অপরাধ সম্পর্কে অবহিতকরণ। প্রবিধান-১২০
- ম্যাজিস্ট্রেটগণের সহিত সহযোগিতা সভা। প্রবিধান-১২৭
- আবগারি অফিসারগণের সহিত সহযোগিতা। প্রবিধান-১২৯
- অভিযুক্তকরণ। প্রবিধান-১৪৪
- আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার। প্রবিধান-১৫৩
- বিশেষভাবে যাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। নিরীক্ষণ প্রবিধান-৩৩৬
- টহল ডিউটি। প্রবিধান- ৩৫৫-৩৬১
- সাধারণ ডায়েরি (জিডি)। প্রবিধান-৩৭৭
- অপরাধ সম্পর্কে গ্যাং রেকর্ড। প্রবিধান-৩৮৮

ট্যুরিস্ট স্পটে অপরাধীদের নজরদারি সংক্রান্ত কার্যক্রম

- নজরদারি প্রবিধান-৩৩৬
- পুলিশ সুপার কর্তৃক নজরদারির আদেশ। প্রবিধান-৩৩৭
- নজরদারির জন্য নাম অপসারণ বা সংযোজন। প্রবিধান-৩৩৮
- দণ্ডপ্রাপ্ত হয়নি এমন ব্যক্তির ওপর নজরদারি। প্রবিধান-৩৩৯
- গ্রাম মাতব্বর, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পুলিশ কর্তৃক নজরদারি। প্রবিধান-৩৪০
- নজরদারি সংক্রান্তে পুলিশের কর্তব্য। প্রবিধান-৩৪১
- দুশ্চরিত্র লোকদের গতিবিধির প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধি। প্রবিধান-৩৪২
- কোনো দলের অপরাধীর ওপর নজরদারি। প্রবিধান-৩৪৫
- কিশোর অপরাধীর ওপর নজরদারি। প্রবিধান-৩৪৬
- শর্তসাপেক্ষে খালাসপ্রাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত অথবা ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬৫ ধারার অধীনে প্রণীত বিধির প্রয়োগ। প্রবিধান-৩৪৮
- যেসব অপরাধী দলের নজরদারি রাখতে হবে। প্রবিধান-৩৫১
- ভ্রাম্যমাণ দুর্বৃত্ত দল। প্রবিধান-৩৫২

- বিদেশি ভবঘুরে। প্রবিধান-৩৫৩
- সরাই এবং পুরাও আইনের অধীন দুশ্চরিত্র এবং সন্দেহভাজন আগন্তুকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রবিধান-৩৫৪

এছাড়াও আধুনিকতার এই যুগে পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধে ট্যুরিস্ট পুলিশ আধুনিক সব প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। যেমন– ক্রাইম ম্যাপিং, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম , কাউন্টারফ্রেট মানি ডিটেকশন, প্যানিকবাটন ফর ট্যুরিস্ট, ফেসিয়াল রিকগ্নিশন টেকনিক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি।

স্পটভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধে ও প্রতিকারে ট্যুরিস্ট পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয়

ট্যুরিস্ট স্পটভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধে ও প্রতিকারে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানা অফিসার ইনচার্জগণের সাথে যোগাযোগপূর্বক তাদের কার্যালয়ে আয়োজিত অপরাধ বিষয়ক সভা-সেমিনারে ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। নিম্নলিখিত স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে এবং ওই সকল তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করবে–

- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি যেমন– জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ
- Tourist Spot নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (প্রত্নতত্ত্ব, বন, পরিবেশ ইত্যাদি বিভাগ)
- সুশীল সমাজ
- সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন
- সাংবাদিক
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
- হোটেল-মোটেল, যানবাহন ও পরিবহণ সেক্টর (বাস/ট্রাক/ভ্যান/ অটো) সংক্রান্ত সংগঠন

ট্যুরিস্ট পুলিশ তাদের কার্যালয়ে যে সকল তালিকা প্রস্তুত করবে–

- পর্যটন গন্তব্যে কী কী অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আছে কিংবা নেই
- পর্যটন স্পটে টিকিট কালোবাজারির সাথে জড়িতদের তালিকা

- লোকাল থানা থেকে চুরি, ছিনতাই, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ও চোরাচালান সংক্রান্ত মামলার বিগত ১০ বছরের চার্জশিটের আসামিদের তালিকাসহ তাদের বিচরণক্ষেত্র ও অবস্থান

গতানুগতিকধারা থেকে ট্যুরিস্ট পুলিশ যেভবে স্বতন্ত্র

- গতানুগতিক ভাবধারার বাইরে গিয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ সদা সর্বদা ট্যুরিস্টদের সেবা প্রদানের মানসিকতা পোষণ করে
- ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রো-অ্যাক্টিভ পুলিশিং করে থাকে
- জনগণ ট্যুরিস্ট পুলিশের কাছে যায় না বরং ট্যুরিস্ট পুলিশই জনগণের কাছে যায়
- ট্যুরিস্ট পুলিশ উন্নত আচরণগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে মানুষের তথা পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সেবায় নিয়োজিত থাকে
- ট্যুরিস্ট পুলিশ Covert (Shadow) ডিউটির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যটকদের পাশে থাকে
- ট্যুরিস্ট পুলিশ পর্যটকদের কাছে Fear নয় বরং Friend

ট্যুরিস্ট পুলিশ পেশাগত দক্ষতা দিয়ে পর্যটকদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিরাপত্তা প্রদান করলে ভ্রমণ শেষে পর্যটকগণ একটি স্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।

ট্যুরিস্ট পুলিশের করণীয়

- হাসিমুখে প্রথাগত উপায়ে সম্ভাষণ জানিয়ে পর্যটকদের সাথে আলাপচারিতার সূত্রপাত করা। কেননা তারা অতিথি হয়ে অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, আচার, বিশ্বাস, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। কেননা পর্যটকদের কাছে এই সকল বিষয় বিশেষ আকর্ষণের। অধিকন্তু স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও এসবে বাধা পেলে তা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে
- পর্যটক ও স্বাগত জনগোষ্ঠীর সাথে সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ করা। তারা যেন বুঝতে পারেন যে, ট্যুরিস্ট পুলিশ তাদেরকে সকল সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে

- পর্যটক ও ট্যুর অপারেটরদেরকে তাদের করণীয় ও বর্জনীয় মেনে চলতে সহায়তা করা
- বিদেশি পর্যটকদেরকে চাহিদা মতো আবাসন খান, মানি এক্সচেঞ্জ, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা
- সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (UNWTO) পর্যটন নৈতিকতা মেনে চলা
- প্রাকৃতিক ও মনুষ্যনির্মিত পর্যটন স্থাপনা ও আকর্ষণসমূহ এবং UNESCO কর্তৃক ঘোষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এদের সুরক্ষায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখা
- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
- সকল অবস্থাতেই নারী ও শিশুদেরকে সাহায্য করুন এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা
- আদিবাসীদের বাড়ি পরিদর্শন ও নারী-পুরুষের সাথে আচরণের পূর্বে তাদের সামাজিক রীতিগুলো জেনে রাখা
- ট্যুরিস্ট পুলিশের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ আচরণবিধি মেনে চলা
- দেশের প্রচলিত আইন এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি মেনে চলা
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট হয় এমন সকল কাজ থেকে পর্যটক ও অন্যদেরকে বিরত থাকতে সাহায্য করা
- পর্যটন গন্তব্য পরিচ্ছন্নতা রাখতে সকলকে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট থাকা
- সকল পর্যটকের নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও স্মরণীয় ভ্রমণ নিশ্চিত করা

ট্যুরিস্ট পুলিশের বর্জনীয়

- কোনো পর্যটকের গায়ে, কাঁধে বা মাথায় হাত না দেওয়া। এমনকি তাকে অ্যারেস্ট করার সময়ও না। তবে কেউ অযাচিতভাবে পালাতে চাইলে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে
- পর্যটকদের যেকোনো সংকটে অসহিষ্ণু হবে না
- কোনো অবস্থাতেই পর্যটকদের সাথে অসদাচরণ করবে না
- পর্যটকদের ছবি তুলতে বা ঠিকানা সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকা
- পর্যটকদের নির্বিঘ্ন ভ্রমণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি না করা

- কোনো পর্যটককে বিরক্ত করবেন না। কিংবা বিরক্ত হতে পারেন এমন কাজ না করা
- কোনো পর্যটককে উপযাচক হয়ে খাবার না দেওয়া কিংবা চেয়ে খাবার না খাওয়া

বিভিন্ন পর্যটন স্পটে নিরাপত্তা সংক্রান্ত টিপস

সুন্দরবন ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা

- সুন্দরবন ভ্রমণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হবে
- সুন্দরবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে দায়িত্বরত নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে যেতে হবে
- আগ্নেয়াস্ত্র, ফাঁদ, মাছ শিকারের কোনো যন্ত্রপাতি সাথে নেওয়া যাবে না
- জীববৈচিত্র্য/প্রাণিসম্পদের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না
- গহিন জঙ্গলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করতে হবে
- নৌযানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ধারণক্ষমতার বেশি যাত্রী পরিবহণ করা যাবে না
- বন বিভাগের অনুমতি ব্যতীত রাত্রিযাপন করা যাবে না

পাহাড় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা

- বর্ষাকালে পাহাড় ভ্রমণ না করে শীতকালে ভ্রমণ করাই উত্তম
- পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণে গেলে মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেমন মশারি ব্যবহার
- পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন। দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত চালক ব্যতীত পাহাড়ি এলাকায় গাড়ি না চালানোই উত্তম
- ট্রেকিংয়ের সময় প্রয়োজনীয় ফাস্ট এইড, শুকনো খাবার এবং পর্যাপ্ত পানি সাথে রাখা
- পাহাড়ে ভ্রমণের পূর্বে আবহাওয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া

বিচ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা

- ভাটার সময় সাগরে নামা যাবে না
- ট্যুরিস্ট পুলিশ, কোস্ট গার্ড, নিরাপত্তা কর্মী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীদের সাইন, সিগন্যাল, ফ্ল্যাগ এবং অন্যান্য সতর্কতা মানতে হবে

- ভারী ও ঢিলেঢালা জামা-কাপড় পরে সাগরে সাঁতার না কাটাই ভালো
- বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত
- সাঁতার না জানলে গভীর সমুদ্রে না যাওয়াই উত্তম
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া সার্ফিং না করা
- লাইফ গার্ড ইক্যুইপমেন্টসের উৎস জানা এবং সাথে নিয়ে সমুদ্রে নামা

পর্যটকদের দায়িত্ব

বর্তমানে বাংলাদেশে যোগাযোগ খাতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এছাড়াও পর্যটন স্পট কেন্দ্রিক অবকাঠামোগত সুবিধা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পর্যটন স্পটগুলোতে পর্যটকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তুলতে পর্যটকগণের দায়িত্বশীল আচরণ একান্ত জরুরি। পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপরে নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে পর্যটকগণ যে সকল বিষয় মেনে চলবেন তার বিবরণ–

পর্যটকদের করণীয়

- হাসিমুখে থাকুন
- স্বাগত জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন
- স্থানীয় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য পোশাক পরুন
- স্থানীয় ভাষার অন্তত ২-৪টি শব্দ শিখুন
- আদিবাসী পল্লিতে যাওয়ার পূর্বে তাদের প্রথা জেনে নিন
- অন্তত ২-১ বেলা স্থানীয় খাবার গ্রহণের চেষ্টা করুন
- গাইডদের কথা মেনে চলুন
- নিয়ম জেনে উপাসনালয়ে প্রবেশ করুন
- দেশীয় যানবাহন যেমন নৌকা, গরুর গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে ঐতিহ্যের স্বাদ গ্রহণ করুন
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় পণ্য কিনুন
- সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন
- প্রয়োজনে ট্যুরিস্ট পুলিশের সহায়তা নিন

পর্যটকদের বর্জনীয়

- পরিবেশের ক্ষতি থেকে বিরত থাকুন

- খোলা খাবার ও যত্র-তত্র পানীয় জল গ্রহণে বিরত থাকুন
- মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন
- কেবল অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও অ্যালকোহল গ্রহণ করবেন না
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ইত্যাদি স্থানে শব্দ করা থেকে বিরত থাকুন
- ধর্মীয় ও সামাজিক আচার নিয়ে কটাক্ষ করবেন না
- রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াবেন না
- জাদুঘর ইত্যাদি নিষিদ্ধ স্থানে ছবি তুলবেন না
- মাদকদ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকুন
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি দিয়ে পর্যটন কেন্দ্রে প্রবেশ করুন

অধ্যায় ১০

ট্যুরিস্ট পুলিশের দক্ষতা উন্নয়ন
Capacity Enhancement of Tourist Police

পর্যটন নিরাপত্তায় সাধারণ দক্ষতার পাশাপাশি কতিপয় বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আগত পর্যটকের সাথে নানাভাবে যোগাযোগ স্থাপন এবং সেবা প্রদানের জন্য এই সকল দক্ষতা জরুরি।

ভাষাগত দক্ষতা

পড়া, শোনা, বলা ও লেখা এই ৪ ধরনের দক্ষতা রয়েছে, এদেরকে বলে Macro Skill অন্যদিকে ব্যাকরণ, শব্দসম্ভার, উচ্চারণ ও বানানরীতি এই ৪ দক্ষতাকে বলে Micro Skill। কোনো ভাষাকে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করতে হলে এই ৮ ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে হয়। কেননা প্রত্যেকটি ভাষারই রয়েছে তাদের নিজস্ব বানান ও উচ্চারণরীতি। এসব পরিপূর্ণভাবে মেনে না চললে ভাষার মৌলিক বিষয়াদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে পর্যটকদেরকে নিয়ে চলতে হলে সকল দক্ষতা প্রয়োগ না হলেও চলে। তাদের জন্য অন্তত শোনা ও বলা এই ২ ধরনের Macro Skill একান্ত আবশ্যকীয়। কেননা পর্যটকদের সাথে ন্যূনতম যোগাযোগ রক্ষার জন্য কমপক্ষে এই দক্ষতাগুলো লাগবে। পাশাপাশি থাকতে হবে উচ্চারণ ও শব্দসম্ভার এই ২ ধরনের Micro Skill। মোট ৪ ধরনের দক্ষতা না থাকলে কোনো বিষয় শুনে বোঝা যাবে না, শব্দসম্ভারের ঘাটতি থাকলে শব্দের অভাবে সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা যাবে না। আবার যেমন পর্যটন, তার রয়েছে নিজস্ব কতগুলো প্রয়োজনীয় পরিভাষাগুলোও শিখতে হবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। পর্যটকদের সেবা প্রদানের পূর্বশর্ত হলো তাদের সাথে অন্তত মৌখিকভাবে

যোগাযোগ স্থাপন করা। ভাষাগত ন্যূনতম দক্ষতা ছাড়া মানসম্মত পর্যটন সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটবে।

উপস্থাপনা দক্ষতা

যেকোনো বিষয় পর্যটকদের কাছে উপস্থাপন করার কোনো বিকল্প নেই। তাই সঠিক ও বোধগম্য রীতিতে উপস্থাপনার দক্ষতা একান্ত আবশ্যকীয়। উপস্থাপনার জন্য দরকার বিষয়বস্তু নির্ধারণ, তারপর প্রস্তুতি নেওয়া এবং সবশেষে তা শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা। ভালো উপস্থাপনা করতে হলে Deliver Skill থাকতে হবে এবং উপস্থাপনা Tool গুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। উপস্থাপনাকালীন সময়ে কণ্ঠস্বর, সঠিকভাবে দেহভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি এবং প্রয়োজন মোতাবেক হাঁটাহাঁটি করতে হবে। সঠিক Eye Contact-এর মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে হবে। বাক্যের হ্রস্ব ও দীর্ঘ যতি মেনে চলতে হবে। তা না হলে শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। বক্তব্যের মাঝে অথবা শেষে শ্রোতাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। উপস্থাপনার সময়ে দ্বিমুখী যোগাযোগব্যবস্থা ধরে রাখতে হবে। উপস্থাপনার সময়ে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে নিরসন করতে হবে।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা

উপস্থাপনা দক্ষতার পরেই দরকার আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা। Verbal, Vocal and Visual এই ৩ রীতিতে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এই ৩ ধরনের একক দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে আন্তঃব্যক্তিত্ব যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করা যাবে না। অন্যদিকে বাধাহীনভাবে যোগাযোগের জন্য যার সাথে যোগাযোগ করা হবে, তারও কতকগুলো দক্ষতা থাকতে হবে। যেমন তার প্রেরকের ভাষা বোঝার সক্ষমতা অর্থাৎ তিনি প্রেরকের নিকট থেকে বার্তা পাওয়ার পর তা সঠিক অর্থ বোঝার সক্ষমতা থাকতে হবে। আবার যোগাযোগ মাধ্যম (Media) পরিষ্কার থাকতে হবে। অতঃপর যোগাযোগ সঠিকভাবে সম্পাদিত হলে গ্রাহক ফিডব্যাকের মাধ্যমে জানাবেন।

পর্যটন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা একান্ত প্রয়োজনীয়। আবেগ, তথ্য ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য এবং সঠিক সেবা প্রদানের জন্য এই দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। চূড়ান্তভাবে এই দক্ষতা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরি করে।

দ্বন্দ্ব নিরসন দক্ষতা

যেকোনো মতের ভিন্নতা থেকে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। দ্বন্দ্ব নিজের সাথে নিজের এবং ২ জন মানুষের মধ্যে হতে পারে। দ্বন্দ্ব ২ প্রকার: ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দ্বন্দ্ব। ধনাত্মক দ্বন্দ্ব থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হয় কিন্তু ঋণাত্মক দ্বন্দ্ব থেকে কলহ তৈরি হয়। সুতরাং ঋণাত্মক দ্বন্দ্বকে নিরসন করতে হয়। দ্বন্দ্ব নিরসনের সাধারণ কৌশল ৫টি: Win-Win, Win-Loss, Loss-Win, Loss-Loss এবং Compromise। Win-Win অর্থ আমিও জয়ী, তুমিও জয়ী। Win-Loss অর্থ আমি জয়ী, তুমি পরাজিত। Loss-Win অর্থ আমি পরাজিত, তুমি জয়ী। Loss-Loss অর্থ আমিও তুমিও পরাজিত এবং Compromise অর্থ দ্বন্দ্ব নিরসনে আরও কিছুটা সময় দরকার। পর্যটন পরিচালনার সময় পর্যটকদের সাথে সেবা প্রদানকারী বা গাইডের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। যা অবিলম্বে দক্ষতার সাথে নিরসন একান্ত জরুরি।

সামাজিক শিষ্টাচার

শিষ্টাচার প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের বিশেষ গুণ পর্যটনের ক্ষেত্রে যা অধিক মাত্রায় প্রযোজ্য। পর্যটন মানুষের মন, আকাঙ্ক্ষা, সেবা ও সন্তুষ্টি নিয়ে কাজ করে। তাই শিষ্টাচার বর্জিত কোনো আচরণ পর্যটনে কল্পনাই করা যায় না। রীতিসিদ্ধভাবে সাদর সম্ভাষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্বজ্ঞান, ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিজ্ঞাপূরণ ইত্যাদি পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ শিষ্টাচার। প্রতিটি পর্যটন কর্মী এমনকি ট্যুরিস্ট পুলিশকেও এই সকল সামাজিক শিষ্টাচার রপ্ত ও প্রয়োগ করতে হবে।

অধ্যায় ১১

পর্যটন পরিভাষা

Tourism Glossary

ট্যুর অপারটের (Tour Operator)

ট্যুর অপারটের একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা বাজার থেকে পাইকারি মূল্যে পর্যটন সেবাসমূহ ক্রয় করে প্যাকেজ তৈরি করে এবং খুচরা মূল্যে প্রত্যক্ষভাবে পর্যটকদের কাছে কিংবা ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় করে। ট্যুর অপারেটর পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় মধ্যস্থতাকারী।

ট্রাভেল এজেন্ট (Travel Agent)

ট্রাভেল এজেন্ট কমিশনের ভিত্তিতে ভ্রমণ সেবাসমূহ বিক্রয় করে থাকে। ট্যুর অপারটের, আবাসন, যানবাহন ইত্যাদির এজেন্ট হিসেবে সাধারণত কাজ করে থাকে।

ট্যুরিস্ট গাইড (Tourist Guide)

কোনো গন্তব্যে বা আকর্ষণে পর্যটকদের গমনকে উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি পর্যটকদেরকে সাথে নিয়ে তাদের দর্শন আকাঙ্ক্ষাকে সফল করেন।

প্যাকেজ ট্যুর (Package Tour)

পর্যটন সেবার একাধিক উপাদান (যেমন যানবাহন, আবাসন, খাদ্য, বিনোদন ইত্যাদি) একত্র করে যখন একটি ভ্রমণ কর্মসূচি তৈরি করা হয়।

আইটিনেরারি (Itinerary)
একটি ভ্রমণসূচি যা ট্যুর অপারেটর কর্তৃক পর্যটকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এতে তারিখ অনুযায়ী ভ্রমণের বিস্তারিত তথ্য থাকে যা অনুযায়ী পর্যটকরা তাদের ভ্রমণ সম্পন্ন করে থাকেন।

আকর্ষণ (Attractions)
পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে পর্যটনের যে সকল উপাদানগুলোকে ব্যবহার করা হয়। যেমন– জাদুঘর, ঐতিহাসিক স্থান, সংগীত বা নাট্যশালা, থিম পার্ক, বিনোদন পার্ক ইত্যাদি।

গন্তব্য (Destination)
পর্যটকরা যে স্থানে গমন করে তাকেই গন্তব্য বলে। যেমন– কোনো শহর, দেশ বা স্থান যা পর্যটকদের কাছে একক সত্ত্বা হিসেবে বাজারজাত করা হয়।

গন্তব্য ভাবমূর্তি (Destination Image)
একটি গন্তব্য সম্বন্ধে পর্যটকদের আস্থা ও প্রতিমূর্তির ভিত্তিতে মানসিক প্রকাশ, অনুভূতি ও ধারণাগত দৃষ্টিভঙ্গির যোগফলকে গন্তব্য ইমেজ বলে।

এসকর্টেড ট্যুর (Escorted Tour)
দলীয় গাইডেড প্যাকেজ পূর্ব নির্ধারিত ট্যুর পরিকল্পনার আওতায় একজন ট্যুর ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে পরিচালিত।

ইকো-ট্যুরিজম (Eco-Tourism)
প্রকৃতি ও পরিবেশ পরিচালিত দায়িত্বশীল ট্যুরিজম, যা পরিবেশ রক্ষা এবং স্থানীয় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক (The International Ecotourism Society-TIES)।

জাতিতাত্ত্বিক ট্যুর (Ethnic Tour)
একটি দেশের আদিবাসী বা গোষ্ঠীর জীবনাচার সংবলিত কার্যাবলি সম্পর্কে জানার জন্য তাদের বসবাসের স্থানে ভ্রমণ করাকে জাতিতাত্ত্বিক ট্যুর বলে।

পরিচিতিমূলক ট্যুর (FAM Tour)
বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশে ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, ভ্রমণ লেখক বা অনুরূপ কোনো ব্যক্তিবর্গকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করানোর জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে যে ভ্রমণের আয়োজন করা হয়।

FIT (Free Independent Travel)
সাধারণত সর্বোচ্চ ৯ সদস্যবিশিষ্ট পর্যটকদের একটি দল যাতে একজন ট্যুর অপারেটর তাদের আবাসনসহ অন্যান্য ব্যবস্থাদি করে থাকে।

GIT (Group Independent Travel)
সাধারণত অন্যূন ৯ সদস্যবিশিষ্ট পর্যটকদের একটি দল যারা পূর্ব নির্ধারিত ভ্রমণসূচি অনুযায়ী গ্রুপ প্যাকেজ ক্রয় করে থাকেন।

পর্যটন আবাসন (Tourist Accommodation)
পর্যটকরা যে সকল স্থানে রাত্রিযাপন করেন তাকে পর্যটন আবাসন বলে। যেমন– হোটেল-মোটেল, বোটেল, রিসোর্ট, হোম স্টে কটেজ, টাইম শেয়ার, ট্রি-হাউজ, ভিলা, সেনেটারিয়াম, ইয়ুথ হোস্টেল ইত্যাদি।

ইনবাউন্ড ট্যুর (Inbound Tour)
অন্য কোনো দেশের পর্যটকরা যখন আমাদের দেশে আসেন। একে পর্যটন রপ্তানিও বলে।

আউটবাউন্ড ট্যুর (Outbound Tour)
নিজ দেশের পর্যটকরা যখন অন্য দেশে ভ্রমণে যান তখন তাকে পর্যটন আমদানি বলে।

সরবরাহকারী (Supplier)
যানবাহন, আবাসন, খাদ্য, বিনোদন সেবাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে যারা সরবরাহ করেন।

তথ্যসূত্র

1. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২
2. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমী, ২০১৭
3. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন, বাংলা একাডেমী, ২০২০
4. হাবিবুর রহমান (সম্পাদক), মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ২০১৮
5. হাবিবুর রহমান ও মোঃ এনায়েত করিম (সম্পাদক), চিঠিপত্র: শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ২০২৩
6. সৈয়দ আরিফ আজাদ, বঙ্গবন্ধু: স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয় বিপ্লব, কালিকলম প্রকাশনা
7. মোনায়েম সরকার (সম্পাদক), বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক দলিল, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, আগামী প্রকাশনী, ২০২১
8. আবু রায়হান, সম্পাদক, পর্যটন ঘরে বাইরে, স্বরচিহ্ন প্রকাশনী
9. প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুর রব ও সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের পর্যটন ভূগোল, হাসি প্রকাশনী

10. সৈয়দ আক্তারুজ্জামান, বাংলাদেশের পর্যটন কালের রেখাচিত্র, ছায়াবিথী প্রকাশনী, ২০১৫
11. মোঃ আব্দুল হামিদ, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পর্যটন, দিব্য প্রকাশনী
12. তৈফিক রহমান, আলো আধারে বাংলাদেশের পর্যটন, ম্যাগনাম ওপাস, ২০১৬
13. Maximiliano E. Korstanje, Editor, The Anthropology of Tourism Security, 2019
14. Peter E. Tarlow, Tourism Security, Butterworth-Heinemanm Publications, 2014
15. Honey, Martha (2008). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (Second ed.). Washington DC: Island Press
16. Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. Journal of Sustainable Tourism
17. UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics
18. Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, Highlights. World Tourism Organization (UNWTO). 18 December 2017
19. https://www.britannica.com
20. https://www.unwto.org
21. https://e-ununwto.org
22. https://www.prothomalo.com
23. https://www.jugantor.com
24. https://timewatch.com.bd
25. https://parjatan.portal.gov.bd
26. https://bangladesh.gov.bd
27. http://www.tourismboard.gov.bd

28. http://bdlaws.minlaw.gov.bd
29. https://mocat.gov.bd
30. https://moca.gov.bd
31. https://www.bbc.com
32. https://moi.gov.bd
33. https://vromonguide.com
34. https://vromonbuzz.com
35. https://wttc.org
36. https://beautifulbangladesh.gov.bd
37. https:// www.whc.unesco.org

ট্যুরিস্ট হেল্প লাইন

+৮৮০ ১৩২০ ২২ ২২ ২২

+৮৮০ ১৮৮৭ ৮৭ ৮৭ ৮৭